নবীন

পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭

সূ চি প ত্র

আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় রূপ ২
জসীমউদ্‌দীন কেন আধুনিক ৪
অংকুর ৭
মহাসাগরে ভাসছে যে মসজিদ! ৮
কতটা নিরাপদ প্যারাসিটামল? ৯
ঘোড়ার পিঠে পাঠাগার! ১১
বিসিএস: লিখিত পরীক্ষার মহারণে (ধারাবাহিক) ১২
রুটিন মেনে সারাদিন ১৪
প্রকল্প সংবাদ ১৬
ফাউন্ডেশন সংবাদ ১৮
ওষুধ কোম্পানিতে হাজারো চাকরির সুযোগ ১৯
অংকুর ২১
মোসাদ্দেকের জ্বালানী সাশ্রয়ী চুলা ২২
দেশে বসে অ্যামাজনে আয়! ২৩
লবণের ক্ষতি ২৫
শীতের ধাঁধা ২৬
বাগ্‌যুদ্ধে জয়ী হতে ৯টি বৈজ্ঞানিক টিপস ২৮
মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে
কে কোথায় পড়ছে ২৯
মাথায় কত প্রশ্ন আসে ৩১

সম্পাদক : তাসনিম হাসান হাই সহকারী সম্পাদক : রওনক আশরাফী

প্রকাশক : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, প্লট নং ২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ৯১২১১৯০, ৯১২১১৯১, ০১৭২৭২০৯০৯৮

২৬ মার্চ ১৯৭১

আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় রূপ

২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। বাংলাদেশের জন্মদিবস। বাংলাদেশের জন্মলগ্নে যারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় ছিল তারাও এখন স্তম্ভিত। এদেশ এখন নতুন পৃথিবীর জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি আমাদের অর্জন সত্যিই আনন্দদায়ক। যদিও আমরা গণতন্ত্রসহ মৌলিক কিছু বিষয়ে স্থায়ী কাঠামো দাঁড় করাতে পারিনি। তারপরও আমরা আশাবাদী, আগামী দিনগুলোতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে দেশবাসী বঙ্গবন্ধুকে ভোট দিয়ে তাঁর হাতে নিজেদের শাসন করার, তাঁদের পক্ষে কথা বলার ক্ষমতা অর্পণ করেন। ১৯৭১ এর ১০ এপ্রিল গৃহীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে তা এইভাবে বিধৃত হয়েছে–'...এরূপ প্রতারণাপূর্ব ব্যবহারের বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় স্বাধীনতার ঘোষণা দান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।'...

বস্তুত বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধতা ছিল জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনের দৃষ্টিতে। আন্তর্জাতিক মহলে এর আইনি বৈধতা দেওয়ার জন্যই গণ-পরিষদ গঠন ও আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণাকে অনুমোদন ও গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ এর 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' গ্রহণ ও বিপ্লবী সরকার গঠন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আইনি বৈধতা দেওয়া ও চলমান যুদ্ধকে একটি কমান্ড স্ট্রাকচারে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একক ভূমিকা পালন করে। চট্টগ্রাম (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) বেতার কেন্দ্র থেকে এম. এ. হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা নিজ কণ্ঠে প্রচার করেন এবং ২৭ মার্চ বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমানও একই কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। একই সময়ে কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, ময়মনসিংহে মেজর এম. শফিউল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেজর খালেদ মোশাররফ, চট্টগ্রামের সীমান্তে কর্মরত মেজর রফিক প্রমুখ সেনা কর্মকর্তাগণ মুক্তিযুদ্ধে শামিল হন। সারাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

৪ এপ্রিল ১৯৭১ এ হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী (অব.) ও লে. কর্নেল এম. এ. রব (অব.) এর নেতৃত্বে যুদ্ধরত পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে পূর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধকে একক কমান্ডে নিয়ে আসতে ওসমানী ও রবকে যথাক্রমে প্রধান ও উপ-প্রধান করে মুক্তিফৌজ গঠন করা হয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আগরতলা ও কলকাতায় সমবেত হয়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন। উভয় অংশের রাজনৈতিক নেতৃত্বই সরকার গঠন ও যুদ্ধ পরিচালনায় একক কমান্ড গঠনে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং সেনাবাহিনীর লোকদেরকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করেন।

The proclamation of Independence-কে আমাদের সংবিধানের অংশ করে নেওয়ায় (অনুচ্ছেদ ১৫০) ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়। অনুচ্ছেদ ১৫০ এর কোনো সংশোধনী না হওয়ায় বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে নিষ্পত্তিকৃত বলেই বিবেচিত। কিন্তু ইতিহাস তো শুধু আইন বা সংবিধান মেনে এগোয় না। ইতিহাসের নিজস্ব গতিময়তা আছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। ২৬ মার্চ পৌঁছতে বাঙালি যে পথ পরিক্রমা করেছে তাও বিবেচনায় রাখতে হবে। ১৯৭০ এর নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে ১২ নভেম্বর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১০ লক্ষ লোক নিহত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকা সফর শেষে ২৬ নভেম্বর তদানিন্তন হোটেল শাহবাগে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্যে বলেন–'ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নিহত ১০ লাখ লোক আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করে গেছে, তা সম্পাদনের জন্য, আমরা যাতে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারি তার জন্য প্রয়োজনবোধে আরো ১০ লাখ বাঙালি প্রাণ দেবে।'

১৯৬৯ সনের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন–'আজ থেকে এ দেশের নাম বাংলাদেশ'। ১৯৭১ এর ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারে তিনি বলেন–'বাঙালিদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে আরো রক্তদানের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত থাকুন।...আমিও আজ শহিদ বেদী থেকে বাংলার জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি, প্রস্তুত হও, দরকার হয় রক্ত দেব।...আমরা স্বাধিকার চাই।...আমি জানি না আবার কবে আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পারবো। তাই আজ আমি আপনাদের এবং সারা বাংলার মানুষকে ডেকে বলছি পরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও।' ২৮ ফেব্রুয়ারি '৭১ ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির সভায় ঘোষণা করেন–'জয় বাংলা' যা কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্লোগান নয়। এটা বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের প্রতীক।

মার্চ জুড়ে অগণিত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানান। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে তিনি আন্দোলন ও সংগ্রামের কৌশল তুলে ধরেন। তিনি বললেন–'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফউজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেইজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সে গুলোর হরতাল কাল থেকে...রিকসা, ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে, শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা–কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।' তিনি বললেন, 'এরপরে যদি বেতন না দেওয়া হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।' বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে দিক-নির্দেশনা দিলেন সংগ্রামী মানুষের করণীয় সম্পর্কে। তিনি বললেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' তিনি আরও বললেন (আসন্ন যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতির ইঙ্গিত দিয়ে)–'যা আছে সবকিছু তোমরা বন্ধ করে দেবে।' 'আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো' (অর্থাৎ সেনানিবাসসমূহের সরবরাহ লাইন বন্ধ করে দিতে হবে)।

একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ কৌশল সেদিন তিনি উপস্থাপন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু, গণতান্ত্রিক পন্থায় অভ্যস্ত এক সংগ্রামী নেতা। সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে যাঁর অভিজ্ঞতা পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হঠাৎ করে তিনি এমন বাস্তবতার সম্মুখীন হলেন যে, দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হলে সশস্ত্র যুদ্ধের কোনো বিকল্প নেই। গেরিলা যুদ্ধেরও রূপরেখা দিলেন তাঁর বক্তব্যে। ঘোষণা দিলেন, ...'আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার দেশের মুক্তি না হয়, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না।' তিনি ঘোষণা দিলেন, 'পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।' 'যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।'

অসহযোগ আন্দোলনকে একটি সুনির্দিষ্ট গতিপথে পরিচালনা করতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তাজউদ্দিন আহমদ নির্দেশাবলী জারী করতে থাকেন। তিনি সর্বমোট পঁয়ত্রিশটি নির্দেশ জারী করেছিলেন। এতে একটি প্যারালাল সরকার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ (নির্বাচনী রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে) স্বাধীনতা ঘোষণার নৈতিক ও আইনগত অধিকার অর্জন করেছিলেন।

২৬ মার্চ আকস্মিক কোনো দিবস বা ঘটনা নয়। ২৬ মার্চ হচ্ছে বাঙালির সযতনে লালিত স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় রূপ। ২৬ মার্চকে আলাদা করে বা ইতিহাসের ধারাবাহিকতার বাইরে রেখে বিবেচনা করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা এতে করে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। শুধু তাই নয়, '৪৭–'৭১ পর্যন্ত এক ধারাবাহিক রাজনীতির ফসল, যার নেতৃত্বে ছিলেন রাজনীতিকরা আর কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন বঙ্গবন্ধু, তাও অস্বীকার করা হয়। রাজনীতির বিপরীতে সমরতান্ত্রিকতাকে দাঁড় করিয়ে পাকিস্তানি দর্শনের আলোকে বাংলাদেশকে সাজাবার অপপ্রয়াস থেকেই উটকো বিতর্ক দাঁড় করিয়ে বিভ্রান্তির জাল বোনা হয়। সুতরাং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসকে আমাদের ইতিহাসের পরম্পরার আলোকে দেখতে হবে। এবং তা হলেই আমরা এক উন্নত বাংলাদেশের পথে অগ্রসর হতে পারব।

■ র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী
কালের কণ্ঠ ২৬ মার্চ ১৯৭১

জসীমউদ্‌দীন (১ জানুয়ারি ১৯০৩-১৪ মার্চ ১৯৭৬)

জসীমউদ্‌দীন কেন আধুনিক

জসীমউদ্‌দীন কি 'পল্লিকবি', নাকি তাঁর কবিতায় আছে আধুনিকতার অন্য এক মাত্রা? জসীমউদ্‌দীনের মৃত্যুবার্ষিকী সামনে রেখে তাঁকে নতুনভাবে অবলোকন

বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের কবিদের নাম বলতে গেলে প্রথমেই যে কয়েকজনের নাম মনে আসে, জসীমউদ্‌দীন তাঁদেরই একজন। তাঁর আগে জন্ম নেওয়া কবিদের মধ্যে মধুসূদন আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁরা বড় হয়েছেন সচ্ছল পারিবারিক পরিবেশে। পরিবারেই তাঁরা পেয়ে গেছেন আধুনিক শিক্ষার উন্নত পরিবেশ। নাগরিক সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বড় হওয়ায় এদিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন তাঁরা। মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের মতো জমিদারপুত্র না হলেও জীবনানন্দ দাশও ছিলেন নগরজীবনের পরিশীলনে এগিয়ে থাকা পরিবারেরই সন্তান। নজরুলের জন্ম গ্রামে। কিন্তু তিনিও প্রধানত নগর সংস্কৃতির পরিশীলনেই নিজের চেতনাকে রঞ্জিত করেছেন। অন্যদিকে, জসীমউদ্‌দীনের জন্ম ও বেড়ে ওঠা গ্রামে! তবে আধুনিক শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে তাঁরও নাগরিক সংস্কৃতির পরিশ্রুতি ঘটেছে। তবে প্রথম তিনজনের সঙ্গে নজরুল ও জসীমউদ্‌দীনের জীবনযাত্রা একটু আলাদা। কারণ, গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে তাঁদের দুজনের সৃষ্টিকর্ম পাখা মেলেছে। এর মধ্যে আবার নাগরিক মানসের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও জসীমউদ্‌দীন প্রধানত গ্রামীণ মানুষের জীবনের রূপকে কবিতা করে তুলে পরিবেশন করেছেন। যদিও তাঁর এই পরিবেশনার লক্ষ্য নগরের মানুষেরাই। নজরুল জসীমউদ্‌দীনের চেয়ে আগেই আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন সৃষ্টিশীলতার বৈশিষ্ট্যে বিদ্রোহী সত্তা বা জাতীয় সত্তার জাগরণকে উপজীব্য করেছিলেন বলে। তাঁর কবিসত্তা অবশ্য জসীমউদ্‌দীনের মতো গ্রামজীবনেই সীমিত থাকেনি। ফলে গ্রামলগ্নতার 'অপরাধে' জসীমউদ্‌দীন আধুনিকদের পঙ্‌ক্তিভুক্ত হতে পারলেন না।

বয়সে জসীমউদ্‌দীনের চেয়ে নজরুল মাত্রই কয়েক বছরের বড়। জীবনানন্দ দাশও নজরুলেরই সমবয়সী। তিনিও জসীমউদ্‌দীনের চেয়ে বয়সে অল্প প্রবীণ। উভয়েই রবীন্দ্রনাথের পরের কবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরের কিছু কবি সচেতনভাবে নিজেদের রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আলাদা বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের আলাদাভাবে 'আধুনিক' বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করলেন। নৈরাশ্য, নির্বেদ, বিবিক্তি আর অনিকেত ভাবনাকে ধারণ করে আছে ওই

'আধুনিকবাদ'। জীবনানন্দ দাশও ছিলেন তাঁদের দলভুক্ত। ক্রমেই এই রবীন্দ্রবিরোধীরাই বেশি প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিলেন বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্যিক সমাজে। নজরুল ওই দলটির চেয়ে একটু আগেই কবিসত্তায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিনিও ছিলেন আলাদা। কিন্তু আলাদা হওয়ার বিশেষত্বে গত শতাব্দীর তিরিশের দশকি আধুনিকদের তিনি ততটা দলভুক্ত ছিলেন না, যতটা ছিলেন জীবনানন্দ। জসীমউদ্‌দীন রবীন্দ্রবিরোধী বলে নিজেকে ঘোষণা দেননি। এমনকি পল্লিজীবন নিয়ে কবিতা লিখলেও তাঁকে কেউ কেউ রবীন্দ্রানুসারীও বলে থাকেন। ফলে তিনিও আধুনিকের দলভুক্ত হতে পারলেন না। জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় আধুনিকতার সন্ধান করতে হলে বাংলা কবিতার এই বিশেষ সময়ের পটভূমিকে স্মরণে রাখতে হবে আমাদের।

গত শতকের তিরিশ দশকি আধুনিকতার সঙ্গে নগরচেতনার একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অথচ জসীমউদ্‌দীন গ্রামজীবনের কবি। তাহলে তিনি আধুনিক হবেন কী করে? এই প্রশ্নটা মাথায় রেখে আমরা যদি তাঁর গোটা জীবনের কথা জানতে চেষ্টা করি তাহলে হয়তো তিনি 'আধুনিক' কি 'আধুনিক' নন, সেই বিতর্কের আড়াল ঘুচতে পারে। হয়তো এর ফলে তাঁর জীবন ও কবিতার সম্পন্ন সৌন্দর্যকে ভিন্নভাবে উপলব্ধি করতে পারব আমরা।

বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকেই বাংলা কবিতার সঙ্গে এই 'আধুনিকতা'র সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠেছে। ফলে বাংলা কবিতার প্রসঙ্গে 'আধুনিকতা' শব্দটি মোটাদাগে যে বোধকে ধারণ করে, তার কথা চলে আসে। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে ওই সময় থেকেই কবিদের মধ্যে কেউ কেউ আধুনিকতার প্রতিনিধি। ফলে আধুনিক না হলে কবিতার আলোচনায় কারও নাম আসা উচিত নয়–এমনও বলতে শোনা গেছে। মানে কবিত্ব আর আধুনিকতা যে এক নয়, সে কথা কারও কারও মনে থাকেনি। যিনি আধুনিক নন, তাঁকে কবি বলে বিবেচনা করতে রাজি নন তাঁরা। কোনো কোনো কবি যথেষ্ট 'আধুনিক' না হয়েও যে শক্তিমান কবি হতে পারেন, এ কথা অনেকেই ভুলে যান। জসীমউদ্‌দীনের কবিত্ব নিয়ে একসময় তাই এমন একটা সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশের কবিতাপ্রেমিকদের একটা অংশের মনে। অথচ জসীমউদ্‌দীন বোঝাতে চেষ্টা করেছেন আমাদের গ্রামবাসীদের নিয়ে যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁরাই সত্যিকারের বাঙালি কবি। আমাদের গ্রামের কৃষক, তাঁতি, কামার, কুমোর, জেলে বা মাঝিদের জীবনযাত্রা বা মনোজগৎ নিয়ে যেসব কবিতা রচনা করা হয়, সেসব কবিতাই সত্যিকারের আমাদের কবিতা। সে কবিতাই বাংলার খাঁটি সম্পদ।

পল্লিজীবনের নানা রূপ জসীমউদ্‌দীনের কবিতার সম্পদ। তাহলে কী হবে, যাকে বলে আধুনিকতা, তার অনেক কিছুই যে তাঁর নেই! তাই সে সারিতে তাঁকে রাখতে কারও কারও আপত্তি ছিল। আর রাখলেও রাখা হয়েছিল নিছকই ব্যতিক্রম হিসেবে। এটা কেন হয়েছে, তা যদি আমরা একটু বুঝে নিতে চেষ্টা করি, তাহলে জসীমউদ্‌দীনকে বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে। হয়তো সুবিধা হবে সামগ্রিকভাবে বাংলা কবিতার সৌন্দর্য অনুভব করতেও।

'পল্লিকবি' ছাপ মারা ছিল বলে নগরজীবনবাদীরা তাঁকে আধুনিকদের দলে রাখতে না চাইলেও নগরেও তাঁর পাঠকপ্রিয়তা ছিল বিপুল। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে যাঁরা কবি হিসেবে 'আধুনিক', তাঁদের চেয়ে অধিকসংখ্যক নগরবাসী মানুষ তাঁর কবিতা ভালোবাসে। কারণ, জসীমউদ্‌দীন যে কবিতা লিখতেন, তা তাঁর সমকালীন বাংলাদেশের বেশিসংখ্যক মানুষের চেনা জীবনের কথা। বাংলাদেশে হাজার বছর ধরে যাঁদের বাস, তাঁদের প্রায় সবাই গ্রামসমাজের অধিবাসী। নদীমাতৃক বাংলাদেশে সব সময় কৃষিই ছিল প্রধান নির্ভরতা। এখন এত যে নগরের বিস্তার ঘটেছে, তাতেও সংখ্যার দিক থেকে নগরবাসীরা গ্রামবাসীদের ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। উপরন্তু যাঁরা নগরে বাস করেন, তাঁদের বেশির ভাগেরই মনে বাস করে গ্রামজীবনের স্মৃতি। ফলে জসীমউদ্‌দীনের সামগ্রিক কবি-চৈতন্য বিবেচনায় রাখলে তাঁর মনোভাবটিও বুঝতে পারা যায়। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে কাব্যবোধের জাগরণ ঘটেছে, তাতে গ্রামের অনুভূতির একটা বড় ভূমিকা রয়েছে।

জসীমউদ্‌দীনের কবিতাকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হলে আধুনিকতা কী, তাঁকে যাঁরা আধুনিক বলে মানেন না, তাঁরা কী বলতে চান, আবার যাঁরা জসীমউদ্‌দীনকেই মনে করেন সত্যিকারের আধুনিক, তাঁরা কেন সে কথা বলেন–সেসব নিয়ে আরও ভালোভাবে ভাবতে হবে আমাদের।

জসীমউদ্‌দীনকে 'পল্লিকবি' বলা হলেও যাঁকে বলে লোককবি তিনি তা নন–মোটাদাগেই তা আমরা বোঝাতে পারি। এ কথা ঠিক যে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক জীবনযাপনের মধ্য থেকেই তাঁর কবিসত্তা জেগে উঠেছে। গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গী নানা শিল্পসংরূপের মাধ্যমেই তাঁর কবিসত্তার প্রকাশ। নৈরাশ্য, নির্বেদ, বিবিক্তি আর অনিকেত ভাবনা তাঁর উপজীব্য নয় বলে তাঁকে আধুনিক কবিদের দলে ফেলা হয় না বটে, কিন্তু অন্য এক অর্থে তিনিও আধুনিকই। কী সেই আধুনিকতা?

বাংলাদেশে ক্রমেই যে নগর গড়ে উঠছে, তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এ কথাও মানতে হবে যে তাতে ইউরোপীয় নগরমানসের বাস্তবতাও নেই। যেসব কারণে ইউরোপে অনিকেত মানসিকতার সৃষ্টি, বাংলাদেশে ওই মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ার ভিত্তি তা

নয়। শিল্পবিপ্লব ও বুর্জোয়া পুঁজির বিকাশের প্রভাবে ইউরোপীয় সমাজে যে ধরনের সামাজিক রূপান্তর ঘটেছিল, তার সঙ্গে বাংলাদেশের সমাজ রূপান্তরের অনেক কিছুরই মিল নেই! ফলে ইউরোপীয় নগরমানসের সঙ্গেও সামগ্রিক অর্থে বাংলার নগরমানসের মিল থাকতে পারে না।

আমরা লক্ষ করব যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের শিল্পসংরূপগুলো তাদের জীবনযাপনের প্রতিক্রিয়াজাত। ফলে বাংলাদেশের একজন কবির আধুনিকতার বোধ ইউরোপের আধুনিকতার বোধের অনুরূপ না-ও হতে পারে। ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতার কারণে জাতীয় জীবনের নিজস্ব সাংস্কৃতিকতার মধ্যেও যে ভিন্ন এক নাগরিক মানসের জন্ম হতে পারে এবং সেই নাগরিক মানসও যে ভিন্নার্থে এক আধুনিকতারই উৎস, সে কথা আমরা ভুলে গেছি বলে জসীমউদ্‌দীনের আধুনিকতাকে আমরা মূল্য দিতে শিখিনি।

তিরিশি আধুনিকতা যে অনুকারী আধুনিকতা এবং এর মধ্যে যে আত্মদীনতা রয়েছে, জসীমউদ্‌দীনের আধুনিকতার বোধে তার জন্য বেদনা রয়েছে। তিনি স্বজাতির আত্মিক উত্থানকে গুরুত্ব দিতেন বলে অনুকারী আধুনিকতাকে অপছন্দ করতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গেও তিনি তাঁর এই মনোভাব প্রকাশে দ্বিধা করেননি। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন :

'...আজকাল একদল অতি আধুনিক কবিদের উদয় হয়েছে। এরা বলে সেই মান্ধাতা আমলের চাঁদ জোছনা ও মৃগ নয়নের উপমা আর চলে না। নতুন করে উপমা অলংকার গড়ে নিতে হবে। গদ্যকে এরা কবিতার মতো করে সাজায়। তাতে মিল আর ছন্দের আরোপ বাহুল্যমাত্র। এলিয়ট আর এজরা পাউন্ডের মতো করে তারা লিখতে চায়। বলুন তো একজনের মতো করে লিখলে তা কবিতা হবে কেন?'

–রবীন্দ্রতীর্থে, ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়, কলকাতা, বলাকা-সংস্করণ, ২০০৭

আরেক জায়গায় জসীমউদ্‌দীন পরিষ্কার বলেছেন এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহিত্যিকদের সম্পর্কে :

'...আমাদের সাহিত্যের পিতা-পিতামহেরা এখন মরিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইতেছেন, তাঁহাদের সাহিত্য হইতে আমাদের সাহিত্য হইবে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁহাদের ব্যবহৃত উপমা, অলংকার, প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া আমরা নতুন সাহিত্য গড়িব। এই নতুন সাহিত্য গড়িতে তাঁহারা ইউরোপ, আমেরিকার কবিদের মতাদর্শ এবং প্রকাশভঙ্গিমা অবলম্বন করিয়া একধরনের কবিতা রচনা করিতেছেন। ...প্রেম-ভালোবাসা, স্বদেশানুভূতি, সবকিছুর ওপরে তাঁহারা স্যাটায়ারের বাণ নিক্ষেপ করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন, বর্তমানের সাহিত্য তৈরি হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের গ্রন্থশালায়, জনসাধারণের মধ্যে নয়।'

–যে দেশে মানুষ বড়, ঢাকা, ১৯৯৭ (প্রথম সংস্করণ: ১৯৬৮)

নিজের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল এই রকম :

'...দেশের অর্ধ শিক্ষিত আর শিক্ষিত সমাজ আমার পাঠক-পাঠিকা। তাহাদের কাছে আমি গ্রামবাসীদের সুখ-দুঃখ ও শোষণ-পীড়নের কাহিনি বলিয়া শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি জাগাইতে চেষ্টা করি। আর চাই, যারা দেশের এই অগণিত জনগণকে তাহাদের সহজ-সরল জীবনের সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে দারিদ্র্যের নির্বাসনে ফেলিয়া রাখে, তাহাদের বিরুদ্ধে দেশের শিক্ষিত সমাজের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইতে।'

–পূর্বোক্ত

জসীমউদ্‌দীনের রচনার এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে আমরা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতার একটু আভাস পাই। স্বসমাজের জাগরণচেতনার আভাসও তাঁর এই গদ্যভাষ্যে মূর্ত হয়েছে। তিনি গ্রামীণ কবিদের আঙ্গিক গ্রহণ করে নক্সীকাঁথার মাঠ (১৯২৯) কিংবা সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৩) রচনা করেন। কেবল এই দুই কাহিনিগাথায়ই নয়, ছোট ছোট গীতিকবিতাগুলোতেও তিনি পুরোনো জীবনবোধের অনুকারী মাত্র থেকে যাননি। কিন্তু আমরা স্পষ্টই অনুভব করি যে এসব কবিতায় তিনি বিষয়বস্তু ও জীবনবোধে বিশ শতকের ভাবধারার অনুসারী। এই আঙ্গিক হতে পারে আমাদের নতুন আধুনিকতার মাধ্যম। আধুনিক কবিতায় যখন গীতিকা আঙ্গিকটি পরিত্যাজ্য তখন জসীমউদ্‌দীনের নক্সীকাঁথার মাঠ ও সোজন বাদিয়ার ঘাট–এই দুই কাব্য ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল আঙ্গিকের প্রাচীনত্ব নিয়ে নয়, নতুন জীবনবোধকে ধারণের সম্ভাবনা নিয়ে। তিনি গ্রাম্য গান সংগ্রহ করতে গিয়ে পরিশীলিত নাগরিক জীবনবোধ দিয়ে লক্ষ করেছেন যে গানের প্রথম কলিটি সুন্দর, কিন্তু পরবর্তী চরণগুলোতে জনগণের কুসংস্কারকেই রূপ দেওয়া হচ্ছে! তিনি তাই প্রথম পঙ্‌ক্তির সুন্দর কলিটিকে রেখে পরের চরণগুলোকে নতুন করে রচনা করে দিচ্ছেন। তাঁরও লক্ষ্য বাংলার নাগরিক মানসের কাছে পৌঁছে যাওয়া। এখানেই তাঁর আধুনিকতা ও তার স্বাতন্ত্র্য।

জসীমউদ্‌দীনের আধুনিকতার মর্মবাণী হচ্ছে বাংলাদেশের আত্মার মধ্য থেকে জেগে ওঠা। বিশ্বের দিকে তাকাও, কিন্তু তাকিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ো না, বরং বিশ্বকে গ্রহণ কর নিজের আত্মাকে সমৃদ্ধ করার জন্য। তাই বলা যায়, জসীমউদ্‌দীন পাশ্চাত্য অনুকারী নগর গড়তে চাননি, চেয়েছিলেন বাংলাদেশের গ্রামের আত্মা থেকে ওঠা নতুন নগর। বিদেশে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পাশ্চাত্য-অনুকারী আমাদের বিরাটগুলো প্রকৃতপক্ষে বিরাট নয়, অতিশয় ক্ষুদ্র। তাই আমাদের গ্রামীণ ক্ষুদ্রের যে বিরাটত্ব তাকেই অবলম্বন করতে হবে। আমাদের গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের মধ্য থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে এর বিরাটত্বকে। এটাই তাঁর আধুনিকতার মর্মবস্তু। তাই জসীমউদ্‌দীনকে 'পল্লিকবি' বলা হলে তাঁর আধুনিকতার এই স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করা হয়। পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় তাঁর দূরদৃষ্টিকে। তাঁর আধুনিকতার অনুসারী কবিদের পেতে আমাদের একুশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কারণ, এই নবীন শতকের তরুণ কবিদের মধ্যেই হয়তো আমরা পাব আত্মবিশ্বাসী আধুনিক কবিসত্তাকে, যাঁরা নিজেদের বিকশিত করবেন, তাঁর দেখানো আধুনিকতার পথে।

■ আহমাদ মাযহার
প্রথম আলো ১১ মার্চ ২০১৬

পরিচয়

মো. রাকিবুল বিশ্বাস
সদস্য নং ১১২৬/২০১৪

নতুন শিক্ষাঙ্গনের সন্ধানে
মায়ের হাসিমাখা মুখটা ফেলে
অজানা ঠিকানায় ছুটে যাই দূর প্রান্তে
একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই যেন হয়।

নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন অঙ্গন
কেমন হবে এই ভেবে উঠলাম ট্রেনে।
উদ্দীপনা, কৌতূহল, ভয় আর স্বপ্ন নিয়ে
জানালার পাশে বসে দেখি
সবুজ ঘাসের বুক চিরে রেল
পথ দেয় পাড়ি এঁকে বেঁকে।
নদ-নদী, খাল-বিল, মাঠ পেরিয়ে
পৌঁছলাম নতুন ঠিকানাতে।

স্কুলের ধার ঘেঁষে যাবার সময়
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতছানি,
আর সেই সাথে অপরিচিত মিষ্টি হাসি
দেখে আমি হয়েছি মুগ্ধ।
নতুন ঠিকানায় না এলে হয়তো বা
রয়ে যেত জীবন অপূর্ণ।

বিকেল বেলা গিয়েছি পদ্মার পাড়ে
হাঁটতে হাঁটতে দেখেছি পদ্মার চর।
কাশবন আর ঝাউয়ের সমারোহ
দেখে আমি হয়েছি বিমোহিত।
সূর্যাস্তের সময় দূর থেকেও দেখা যায়
জোনাকি পোকার মিটিমিটি আলো।
শেয়ালের ডাক আর নদীর কুলকুল ধ্বনি
যেন হৃদয়টাকে যায় স্পর্শ করে।

চা খেতে খেতে জমে উঠেছে আড্ডা
মধ্য রাত পর্যন্ত করেছি ঝগড়া
সেইসব মানুষের সাথে
যাদের কথা আজও ভুলিনি।
ঘুম থেকে না উঠতেই চা-বিস্কুট আর মুড়ি
মৃদু হেসে, 'এইটুকু খেয়ে নাও বাবা'!
হরেক রকম রান্না আর ভর্তা,
পান্তা ভাত, ইলিশ মাছ আর গরুর গোস্ত
খেতে কত যে মজা! তা আজও অনুভব করি।

তিন দিনের পরিচয়ে–
মা-সন্তানের মতো যে সম্পর্ক উঠেছে গড়ে
এ তো তিন দিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য।
জীবন স্রোতে কত মানুষ আসে যায়
তাদের কথা কি কখনো ভোলা যায়?

কতটা আপন হয়েছি বুঝেছিলাম তখনি
যখন গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে
বলেছিল 'বাবা আবার এসো'
আজও সেই ধ্বনি আমার হৃদয়ে বাজে।

সেই মানুষটির কথাও বুঝেছিলাম
যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে
হাতটাও নাড়াতে পারেনি।
মনের অগোচরে রয়েছিল কিছু কথা
যা আমায় বলতে পারেনি।

এখনো সেই ছোট্ট মুখের
মিষ্টি হাসি মনে পড়ে–
'ভাইয়া আমাকে একটু খাইয়ে দাও না'!
এখনো মনে হয়, সেই তিন দিন
আর জীবনে পাব কি কখনো?

তিন দিনের পরিচয়ে
যে মায়ার বন্ধনে হয়েছি আবদ্ধ
খাতা-কলম আর কবিতায়
যাবে না করা তা লিপিবদ্ধ।

মহাসাগরে ভাসছে যে মসজিদ!

মহাসাগর শব্দটি শুনলেই আমাদের বুকের ভেতরটা কেমন যেনো হাহাকার করে ওঠে। কল্পনার ক্যানভাসে ভেসে ওঠে শুধু সফেদ ফেনা আর নীল পানি, থেকে থেকেই যেখানে বিশাল আকারের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ে। কিন্তু কাউকে যদি বলা হয় মহাসাগরের বুকেই ভাসমান রয়েছে একটি মসজিদ, তাহলে প্রথমবার যে কেউ তা অবিশ্বাস করতে বাধ্য। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে গ্র্যান্ড মস্ক হাসান-২ নামের মসজিদটির এক তৃতীয়াংশ মহাসাগরে অবস্থিত!

গ্র্যান্ড মস্ক হাসান-২ মসজিদটি যে শুধুমাত্র আটলান্টিক মহাসাগরের বুক চিরে অবস্থান করেই একটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে, তা কিন্তু নয়। এটি মরক্কোসহ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় মসজিদের মর্যাদাও লাভ করেছে। মসজিদটি তৈরি করেন মরক্কোর বাদশাহ দ্বিতীয় হাসান এবং নির্মাণ করেন ফরাসি কোম্পানি বয়গিস। আর এর নকশা করেন ফরাসি স্থপতি মিশেল পিনচিউ।

২২ দশমিক ২৪ একর জায়গার ওপর অবস্থিত এই মসজিদটিতে একসাথে লক্ষাধিক মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারেন। নারীদের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদটিতে রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। এছাড়া মসজিদটির আরেকটি নজরকাড়া বিশেষত্ব হলো এর ছাদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তিন মিনিট পরপর খুলে যায়।

বৃষ্টির সময় ছাড়া মসজিদটির ছাদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তিন মিনিট পরপর খুলে যায়, যাতে করে মসজিদের ভেতরে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে।

গ্র্যান্ড মস্ক হাসান-২ মসজিদটির উচ্চতা ৬৫ মিটার। মেহরাবের উচ্চতা দুইতলা ভবনের সমান এবং মিনারের উচ্চতা ২১০ মিটার বা ৬৮৯ ফুট। সুবিশাল এই মিনারের ওপরে রয়েছে লেজার রশ্মি, যা নাবিকদের পবিত্র কাবা শরীফের পথ দেখিয়ে থাকে। মসজিদটির মিনার এতোটাই উঁচু যে ৩০ কিলোমিটার দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যায় এই লেজার রশ্মি।

মসজিদটির মূল ভবনের সাথেই রয়েছে ওযুখানা, লাইব্রেরি ও কুরআন শিক্ষালয়। শুধু তাই নয়, মসজিদটিতে রয়েছে একটি কনফারেন্স রুমও। আড়াই হাজার পিলার মসজিদটিকে ধারণ করে আছে। এর ভেতরের পুরোটাই টাইলস বসানো। মসজিদের ভেতরের পাশাপাশি বাইরেও দেখা যায় নান্দনিকতার ছোঁয়া।

মসজিদ এলাকার পুরো জায়গাজুড়ে অবস্থান করছে ১২৪টি ঝরনা ও ৫০টি ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি। কোন কোন স্থানের সৌন্দর্য বাড়াতে করা হয়েছে স্বর্ণপাতের ব্যবহার। মসজিদটির আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি ১০ মিটার উচ্চতার সামুদ্রিক ঢেউ ভেঙে দেবার ক্ষমতা রাখে। এমনকি মসজিদের ভেতর থেকে সমুদ্রের কোন গর্জনও শোনা যায় না।

দূরের কোন জাহাজ থেকে মসজিদটি দেখলে মনে হয় তা যেনো সমুদ্রের উপর ভাসছে আর মুসল্লিরা নামাজ পড়ছেন সমুদ্রের পানির উপর।

মেহেদী হাসান গালিব
সময়ের কণ্ঠস্বর ৪ নভেম্বর ২০১৬

কতটা নিরাপদ প্যারাসিটামল?

হাতব্যাগ, ড্রয়ার বা হাতের কাছেই ওষুধ রাখার পাত্রে খুঁজলে হয়তো সবার কাছেই পাওয়া যাবে প্যারাসিটামল। জ্বর হোক বা মাথা ব্যথা, একটু সর্দি ঝরল বা গলা ব্যথা হলো কিংবা পা মচকে গেল, এমনকি দাঁতে তীব্র ব্যথা হলেও হাতের কাছে থাকা এ প্যারাসিটামলই প্রাথমিক ভরসা। কিন্তু নিরাপদ বলে আপাতত বিবেচিত ওষুধটি আসলে কতটা নিরাপদ!

সাধারণের কাছে ওষুধটি নিরাপদ বলেই বিবেচিত। যদিও কয়েক বছর আগে আমাদের দেশে প্যারাসিটামল সিরাপের বিষক্রিয়ায় কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনাও আছে। আর কয়েক মাস আগে প্যারাসিটামলের সঙ্গে অন্য একটি ওষুধের সংমিশ্রণে তৈরি ওষুধগুলোও বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়েছে। প্যারাসিটামল ওষুধটি শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বজুড়েই কোনো ধরনের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেনা যায়। মূলত ব্যথানাশক হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়।

প্যারাসিটামল অ্যাসিটামিনোফেন নামেও পরিচিত। মাথা ব্যথা, গা ব্যথা, দাঁত ব্যথা, মাসিকের ব্যথা, সর্দি, গলা ব্যথা, আর্থ্রাইটিসের মতো দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা, জ্বরসহ বহু অবস্থায় ওষুধটি ব্যাপক ও যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি সপ্তাহে মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ বা পাঁচ কোটি মানুষ প্যারাসিটামল সেবন করে।

ব্যথানাশক হলেও অন্যান্য ব্যথানাশকের (এনএসএআইডি) মতো পাকস্থলী বা হার্টে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। অনেক ক্ষেত্রে যখন অন্য ধরনের ব্যথানাশক রোগীর জন্য নিরাপদ বিবেচনা করা হয় না, তখন প্যারাসিটামলই ভরসা হিসেবে কাজ করে। যেমন–গর্ভকালীন। ফার্স্ট ট্রাইমস্টার বা প্রথম তিন মাসেও প্যারাসিটামল সেবনে গর্ভস্থ শিশুর বিকলাঙ্গ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায় না। কিন্তু কিছু গবেষণায় আবার এমন তথ্য উঠে এসেছে, যা দেখে ওষুধটি আর আগের মতো নিরাপদ ভাবার কারণ নেই। গত বছর অ্যানালস অব দ্য রিউম্যাটিক ডিজিজ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে দেখা গেছে, প্যারাসিটামল হার্টের অসুখের ঝুঁকি বাড়ায় এবং কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুরও কারণ ঘটায়।

লিভারের ক্ষতি

প্যারাসিটামলে যে লিভার বা যকৃতের ক্ষতি হয়, তা আগেই জানা গিয়েছিল। সেজন্য ডিএল মিথিওনিন যুক্ত করে নিরাপদ প্যারাসিটামল বাজারে ছাড়া হয়েছিল। তখন দেখা গেল, ডিএল মিথিওনিন উপকারের চেয়ে ক্ষতি করছে অনেক বেশি। তাই ওষুধটি বিশ্বজুড়েই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে ২০০০ সালের আগেই। বাংলাদেশে অবশ্য মাত্র এক বছর আগে এটি বন্ধ করা হয়েছে। প্যারাসিটামল সেবন করলে তা লিভারে গিয়ে মেটাবলিজম বা বিপাক হয়। ব্যবহৃত উপাদানগুলো বাদে বাকি অংশ প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায়; কিন্তু মেটাবলিজম হওয়ার সময়ই কিছু উপাদান টক্সিন বা বিষে পরিণত হয় এবং লিভারের কোষকে ধ্বংস করতে পারে। যত বেশি প্যারাসিটামল সেবন করা হবে, তত বেশি লিভারের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ডোজ স্বাভাবিকের মাত্রা অতিক্রম করলে লিভার পুরোপুরি নষ্ট হয়ে রোগী মারাও যেতে পারে। অ্যাকিউট লিভার ফেইলিওরের অন্যতম বড় কারণ প্যারাসিটামল ওভারডোজ। ছোট্ট একটি পরিসংখ্যান দেখলে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। ১৯৯০ থেকে পরবর্তী ১০ বছরে শুধু আমেরিকায় প্যারাসিটামলজনিত লিভারের অসুখে ২৬ হাজার জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল এবং এর মধ্যে সাড়ে চার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। মূলত এ জটিলতা হয়েছিল–যারা ডোজ নিয়ন্ত্রণ করে সেবন করেনি তাদের ক্ষেত্রে।

সাধারণত একটি প্যারাসিটামল ট্যাবলেট ৫০০ মিলিগ্রামের হয়। শুধু ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ আটটি এ মাত্রার প্যারাসিটামল সেবন করা যায়। লিভারের অসুখ একদিন অতিরিক্ত ডোজ সেবন করলেই হতে পারে। তা ছাড়া প্রায়ই যদি নানা কারণে প্যারাসিটামল সেবন করা হয়, তাহলেও ধীরে ধীরে লিভারের কিছু কিছু ক্ষতি হয়।

ত্বকের অ্যালার্জি ও রক্তের ক্যান্সার

ত্বকের অ্যালার্জির সঙ্গে প্যারাসিটামলের সম্পর্ক আছে। কিছু ক্ষেত্রে এ ধরনের অ্যালার্জি রোগীর মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। মারাত্মক ধরনের অ্যালার্জির মধ্যে আছে স্টিভেন জনসন সিনড্রোম বা এসজেএস, টক্সিক অ্যাপিডার্মাল নেকরোলাইসিস। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ের কথা, রক্তের কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে প্যারাসিটামল সেবন। জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল অনকোলজিতে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্যারাসিটামল সেবনের সঙ্গে রক্তের কিছু ক্যান্সার বা ব্লাড ক্যান্সারের সম্পর্ক আছে, বিশেষ করে লিম্ফোমা ও লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রে। এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল ৬৪ হাজার মানুষের ওপর।

অ্যাজমা, অটিজম, এডিএইচডি

গর্ভকালীন প্যারাসিটামল সেবনে গর্ভস্থ শিশুর জন্মগত ত্রুটি হয় না; কিন্তু অন্য ধরনের ক্ষতি হতে পারে। সম্প্রতি নরওয়েজিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ পরিচালিত এক গবেষণায় এ-সংক্রান্ত কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। যেমন–গর্ভকালীন প্যারাসিটামল সেবনে অ্যাজমার প্রকোপ বাড়ে। শ্বাসকষ্ট বেশি হয়। এমনকি অনাগত সন্তানের অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। অতিরিক্ত চঞ্চলতাজনিত অসুখ বা মনোযোগ ঘাটতিজনিত অসুখ বা এডিএইচডিও বেশি হয় গর্ভকালীন প্যারাসিটামল সেবনে। স্পেনে পরিচালিত আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভকালীন প্যারাসিটামল সেবন করলে গর্ভস্থ ছেলেশিশু অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার বেশি ঝুঁকিতে থাকে।

তাহলে?

প্যারাসিটামল সেবন বাদ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। নিয়ন্ত্রণ করা বা অতিরিক্ত সেবন না করার কথা বলা হচ্ছে। সতর্কতা হিসেবে মনে রাখতে হবে কিছু কথা।

- প্যারাসিটামল আছে এমন ওষুধ একসঙ্গে একাধিক সেবন করবেন না।
- নিয়মিত প্যারাসিটামল সেবন করতে হয় এমন অবস্থা হলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
- কোনো অবস্থায়ই দিনে আটটি বা তার বেশি প্যারাসিটামল (৪০০০ মিলিগ্রাম) সেবন করবেন না।
- আগে থেকেই যাঁদের লিভারের অসুখ আছে, তাঁরা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া প্যারাসিটামল সেবন করবেন না। লিভারের অসুখ আছে–এ তথ্যটি ডাক্তারকে জানান।
- অ্যালকোহল সেবন করলে প্যারাসিটামল নেওয়া যাবে না।
- গর্ভকালীন যখন-তখন প্যারাসিটামল সেবন করবেন না।
- তিনদিনের বেশি হয়ে গেছে অথচ জ্বর ছাড়ছে না–এমন ক্ষেত্রে প্যারাসিটামল সেবন না করা ভালো।

প্যারাসিটামলের ডোজ

- বয়স ও ওজনভেদে একেকজনের জন্য প্যারাসিটামলের ডোজ আলাদা। তাই যখন-তখন ওষুধটি সেবন করবেন না। ডোজ মেনে সেবন করুন।
- প্রাপ্তবয়স্ক ও ৫০ কেজি বা তার বেশি ওজন হলে সর্বোচ্চ ১০০০ মিলিগ্রাম করে দিনে চারবার। একসঙ্গে ১০০০ মিলিগ্রামের বেশি নয় কিছুতেই।
- প্রাপ্তবয়স্ক কিন্তু ওজন ৫০ কেজির নিচে হলে প্রতি কেজি অনুপাতে ১৫ মিলিগ্রাম পরিমাণ ওষুধ প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর সেবন করা যায়।
- এক্সটেন্ডেড রিলিজ আকারে যে প্যারাসিটামলগুলো বাজারে পাওয়া যায়, তা আট ঘণ্টা পরপর ১৩০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত সর্বোচ্চ সেবন করা যায়।
- বয়স দুই বছরের কম হলে প্রতি কেজি অনুপাতে ১০ থেকে ১৫ মিলিগ্রাম ওষুধ মুখে সেবনযোগ্য। যেমন–বাচ্চার ওজন ১০ কেজি হলে প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর ১০০ থেকে ১৫০ মিলিগ্রাম প্যারাসিটামল সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা যায়।
- ২ থেকে ১২ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ওজন অনুপাতে সাড়ে ১২ মিলিগ্রাম করে ছয় ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা যায়।
- ১২ বছরের বেশি বয়স হলে প্রতি কেজি ওজন অনুপাতে ১৫ মিলিগ্রাম প্যারাসিটামল প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়।
- কিডনি ও লিভারের অসুখ থাকলে ডোজ অনেক কমাতে হয়। এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে।

অধ্যাপক ডা. মো. জুলহাস উদ্দিন

কালের কণ্ঠ ১৩ আগস্ট ২০১৬

ঘোড়ার পিঠে পাঠাগার!

পাঠাগার মানেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে হাজারো বইয়ে ঠাসা পিনপতন নীরব একটি কক্ষ। যেখানে আপনমনে সবাই পড়ছেন, হারিয়ে গিয়েছেন বইয়ের ভুবনে।

বর্তমানে অবশ্য পাঠাগার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এসেছে। আগে পাঠকরা পাঠাগারে গিয়ে পড়লেও এখন পাঠাগারই চলে আসছে আপনার দরজায়। বাংলাদেশে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় চালু আছে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার। যেখান থেকে ছেলে-বুড়ো সবাই সংগ্রহ করতে পারছেন নিজ পছন্দের বই।

এমনই এক ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার চালু আছে ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম সেরাংয়ে। তবে বাস বা ট্রাকে নয়, সেই পাঠাগার চলে ঘোড়ার পিঠে!

জাভা দ্বীপের বানটেন প্রদেশের গ্রামটিতে এ পাঠাগার চালু করেছেন রিদওয়ান সুরুরি। একটি সাদা ঘোড়ার পিঠে বইয়ে ঠাসা ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার নিয়ে তিনি ছুটে চলেন পুরো গ্রামে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটি দিনে বই নিয়ে গ্রামে পৌঁছান সুরুরি।

সুরুরির ঘোড়ার শব্দ পেলেই ছুটে আসে গ্রামের শিশুরা, আর ফিরে নতুন বইয়ের গন্ধ নিতে নিতে।

এই পাঠাগারের সদস্য কেবল ছোট্ট শিশুরাই নন। বয়স্করাও রিদওয়ানের পাঠাগারের নিয়মিত সদস্য। তবে পাঠাগারের সদস্যদের

নতুন বই নিতে হলে আগের সপ্তাহে নেয়া বই ফেরত দিতে হয়। আর বইগুলো পড়তে হবে সযত্নে।

সুরুরি বলেন, তেমন কোনো পরিকল্পনা ছিল না। এক বন্ধুর কাছ থেকে ১০০টি বই নিয়ে ২০১৫ সালে পাঠাগারটি চালু করি। ধীরে ধীরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার সহায়তায় বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে।

দেশটির শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৩ সালে শিক্ষার হার ৯৬ শতাংশে পৌঁছেছে। তবে জাভাসহ বেশ কয়েকটি প্রদেশ শিক্ষার হারের দিক থেকে এখনো পিছিয়ে। এ অবস্থার পরিবর্তন ও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে সুরুরির 'ঘোড়ার পিঠের পাঠাগার' দৃষ্টান্ত হতে পারে বলে মনে করেন স্থানীয়রা।

সূত্র : যুগান্তর
১৮ জুলাই ২০১৬ [বিডিলাইভ২৪]

বিসিএস : লিখিত পরীক্ষার মহারণে

৩৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শেষ হলো সম্প্রতি। পরীক্ষার নানা কলাকৌশল নিয়ে বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ দিয়েছেন বিগত পরীক্ষার শীর্ষ মেধাবীরা। ছয় কিস্তির ধারাবাহিকের প্রথম পর্বে বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র।

বিসিএস লিখিত পরীক্ষা শুধু পাস-ফেলের পরীক্ষা নয়। ভালো নম্বর পেয়ে পাস করার পরীক্ষা। ভালো নম্বর না পাওয়া আর ফেল করা এখানে প্রায় সমান কথা। ভালো নম্বর তুলতে না পারলে ভালো ক্যাডার পাওয়া যাবে না। তাই প্রস্তুতিটাও হওয়া চাই তেমন। ১০০ নম্বর বরাদ্দ বাংলা প্রথম পত্রে। দ্বিতীয় পত্রে আরো ১০০। প্রথম পত্র সাধারণ ও টেকনিক্যাল উভয় ক্যাডারের প্রার্থীদের। বাংলা দ্বিতীয় পত্র শুধু সাধারণ ক্যাডারের জন্য। মায়ের ভাষা বলে অনেকেই বাংলাকে হেলাফেলা করেন। হেলাফেলা করলেই সর্বনাশ। বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় যেকোনো বিষয়ই গড়ে দিতে পারে বড় ব্যবধান। আর লিখিত পরীক্ষার মহারণে বাংলা তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ঢাল-তলোয়ার মানে পুঁজি নিয়েই লড়াইয়ে নামুন। রণক্ষেত্রে এটিই এগিয়ে রাখবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে। মেধা নিশ্চয়ই আছে। একটুখানি কৌশলী, বাকিটা পরিশ্রমী হলে জয় আপনার হবেই হবে।

কোন অংশে কত

প্রথমেই চোখ বুলিয়ে নিন সিলেবাসে। জানেন নিশ্চয়ই, ৩৫তম বিসিএস থেকে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে নতুন সিলেবাসে। প্রথমেই বাংলা প্রথম পত্র। ব্যাকরণ অংশে বরাদ্দ ৩০ নম্বর। প্রশ্ন করা হবে শব্দগঠন, বানান বা বানানের নিয়ম, বাক্যশুদ্ধি বা প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, প্রবাদ-প্রবচন ও বাক্যগঠন থেকে। লিখতে হবে ভাবসম্প্রসারণ ও সারমর্ম। প্রতিটিতে নম্বর বরাদ্দ ২০ করে। বাকি ৩০ নম্বর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে। এ অংশে শর্ট টাইপের প্রশ্ন বেশি হতে পারে।

দ্বিতীয় পত্রে ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ, কাল্পনিক সংলাপ লিখন, পত্রলিখন, গ্রন্থ সমালোচনা–প্রতিটিতে ১৫ নম্বর করে মোট ৬০ নম্বর বরাদ্দ। সবচেয়ে বেশি নম্বর রচনা লিখনে। এতে থাকবে ৪০ নম্বর।

সিলেবাস ও প্রশ্ন দেখে প্রস্তুতি

প্রথমেই সিলেবাসে চোখ বুলিয়ে নিন। তারপর নজর দিন বিসিএসে আসা বিগত বছরের প্রশ্নগুলোর দিকে। এতে প্রশ্ন কেমন হতে পারে, সে বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা পেয়ে যাবেন। ১০ম থেকে ৩৬তম বিসিএসের ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রশ্ন প্রস্তুতিতে কাজে আসবে। বিগত সালের পরীক্ষায় আসা ব্যাকরণ, শুদ্ধিকরণ, প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা, বিভিন্ন ধরনের পত্র লেখার নিয়ম ভালো করে পড়ুন।

দরখাস্ত, মানপত্র বা চিঠি ইত্যাদি লেখার নিয়ম আয়ত্ত করতে পারলে প্রশ্ন যে রকমই হোক না কেন, উত্তর লিখে আসতে পারবেন। বিগত সালে পরীক্ষায় আসা সারমর্ম বা সারাংশ ও ভাবসম্প্রসারণের উত্তর বানিয়ে লেখার অভ্যাস করুন। যত বেশি অনুশীলন করবেন, তত লাভ হবে।

দরকারি বইপত্তর

হুমায়ুন আজাদের 'লাল নীল দীপাবলি অথবা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী' বইটি বেশ কাজের। বইটিতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ইতিহাস খুব সুন্দরভাবে সহজ-সরল ভাষায় লেখা। মাহবুবুল আলমের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইটিও পড়তে পারেন। ব্যাকরণ অংশের জন্য হুমায়ুন আজাদের 'কতো নদী সরোবর অথবা বাংলা ভাষার জীবনী' বইটি বেশ সহায়ক হবে। এ ছাড়া নবম-দশম শ্রেণির বোর্ডের বাংলা ব্যাকরণ বই তো আছেই। বাংলা বানান, শুদ্ধিকরণ প্রভৃতি নিয়ে মাথাব্যথার কারণ নেই। এগুলোর জন্য বাংলা একাডেমি প্রণীত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের একেবারে শেষে 'প্রমিত বাংলা বানান' নামে একটি অধ্যায় আছে। মনোযোগ দিয়ে এই অংশটা দেখলে বানান বিষয়ে ভালো ধারণা পাবেন।

এগিয়ে থাকবেন সৃজনশীলরাই

একটুখানি খেয়াল করলেই দেখবেন, লিখিত পরীক্ষায় দুই ধরনের প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। একটি ব্যাখ্যামূলক, যাতে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যায় না। যেমন রচনা, ভাবসম্প্রসারণ। আর অন্যটি হলো সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন, মানে ব্যাকরণ। এতে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যায়। নম্বর বিভাজনের দিকে ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন, ২০০ নম্বরের মধ্যে ১৪০ নম্বরেই মুখস্থবিদ্যার বালাই নেই। ভাবসম্প্রসারণ, সারমর্ম, বাংলা অনুবাদ, কাল্পনিক সংলাপ লিখন, পত্রলিখন, গ্রন্থ সমালোচনা, রচনা লিখন সাধারণত কমন পড়ে না। এতে লিখতে হবে নিজের ভাষায় কিংবা বুঝেশুনে। এ ক্ষেত্রে যেটা করবেন তা হলো, এগুলো লেখার সাধারণ নিয়মগুলো জেনে যাবেন। মাথায় রাখবেন প্রয়োজনীয় সব তথ্য-উপাত্ত। এর সঙ্গে চর্চাটা যোগ করলেই হলো, তাতেই সই।

বুঝতেই পারছেন, প্রার্থীকে নিজের মতো ভাবনাচিন্তার ও লেখার স্বাধীনতা দেওয়া হয় এই লিখিত পরীক্ষায়। কেউ যদি কোনো বিষয় সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন, তবে নিজের মতো করে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়। তাই সৃজনশীলরাই এতে এগিয়ে থাকে।

প্রস্তুতি নেবেন যেভাবে

ব্যাকরণ অংশে কিছু টপিকস নির্দিষ্ট আছে। যেমন শব্দগঠন, বানান ও বানানের নিয়ম, বাক্যশুদ্ধি ও প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, প্রবাদের নিহিতার্থ ব্যাখ্যা ও বাক্যগঠন মনোযোগ দিয়ে পড়লে অল্প সময়ে এর জন্য ভালো প্রস্তুতি নেওয়া যায়। ব্যাকরণ অংশের জন্য কতো নদী সরোবর অথবা বাংলা ভাষার জীবনী, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, ভাষা-শিক্ষা, দর্পণ বুঝে বুঝে পড়তে হবে। ভাবসম্প্রসারণের জন্য দেখতে পারেন দর্পণ ও ভালোমানের আরো দু-একটি বই। সহজ-সুন্দর ভাষায় ২০টি প্রাসঙ্গিক বাক্য লিখলেই চলে ভাবসম্প্রসারণে। উদাহরণ আর উদ্ধৃতি দিলে মান বাড়বে। সারমর্ম লিখতে হবে তিন-চারটি সহজ-সুন্দর বাক্যে।

সাহিত্য অংশটির পরিধি বেশ বড়। তাই যেটা করবেন, পিএসসি নির্ধারিত লেখক সম্পর্কে প্রথমে ভালো করে পড়বেন। তারপর বাছাই করে অন্য লেখকদের সাহিত্যকর্ম দেখবেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর লাল নীল দীপাবলি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস–বইগুলো থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো বাদ দিয়ে পড়তে পারেন। উদ্ধৃতি দিলে এতে নম্বর বেশি পাবেন।

গ্রন্থ সমালোচনা কঠিন ঠেকতে পারে। গ্রন্থ সম্পর্কে না জানলে বা বইটি না পড়ে থাকলে লিখতে পারবেন না। তাই এই অংশে সময় দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিখ্যাত বইগুলোই পড়বেন। যদিও এ রকম বইয়ের তালিকাটাও বেশ দীর্ঘ। তবে অনেকেই জেনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন, বিগত দুই বিসিএসে গ্রন্থের নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। প্রশ্ন করা হয়েছিল থিম উল্লেখ করে।

অনুবাদে অনুশীলন

অনেকের কাছেই এটি সবচেয়ে কঠিন ঠেকে। দৈনিক পত্রিকার আর্টিকেল আর সম্পাদকীয় থেকে একটি বাংলা থেকে ইংরেজি আর একটি ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের চর্চা করুন প্রতিদিন, কাজে আসবে। এতে আপনার আরো কিছু অংশের প্রস্তুতি হয়ে যাবে। আর কারো যদি ইংরেজির মৌলিক জ্ঞান ভালো থাকে, তবে অনুবাদ এমনিই পারবেন।

কাল্পনিক সংলাপের জন্য পেপারে গোলটেবিল বৈঠকগুলোর মিনিটস্, টক শো, গাইড বই থেকে বিভিন্ন টপিক সম্পর্কে ধারণা নিন। ভাষা-শিক্ষা আর বিভিন্ন গাইড বই থেকে পত্রলিখন পড়তে পারেন।

জোর দিন রচনায়

বাংলায় সবচেয়ে বেশি নম্বর বরাদ্দ রচনা লিখনে। এতে থাকবে ৪০ নম্বর। রচনা আসতে পারে সমসাময়িক কোনো ইস্যু, জাতীয় সমস্যা ও সমাধান, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা-আন্দোলন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে। বাংলা রচনা কতটুকু লিখবে–এ নিয়ে অনেকের চিন্তার শেষ নেই। অনেকেরই ধারণা, যত বেশি লেখা যায় নম্বর তত বেশি। এটা মোটেই ঠিক নয়। প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত ছাড়া যদি অযথাই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরাট করে যান, তাতে খুব বেশি ফায়দা হবে না। এটা পরীক্ষকের বিরক্তির উদ্রেক ঘটাতে পারে। রচনা যত বেশি তথ্য-উপাত্তসমৃদ্ধ করতে পারবেন, ততই ভালো। রচনায় ভালো করার জন্য দৈনিক পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় পাতা নিয়মিত পড়লে কাজে দেবে। টপিক ধরে ধরে ফ্রিহ্যান্ড লেখার অভ্যাসও এগিয়ে রাখতে পারেন।

উপস্থাপনার ওপর অনেক কিছু

অনেকেই বলেন, বাংলায় লিখতে হয় প্রচুর, কিন্তু নম্বর ওঠে কম। এ অভিযোগটি পুরোপুরি সত্য নয়। আপনার লেখা যদি পরিচ্ছন্ন ও তথ্যবহুল হয়, তাহলে পরীক্ষক অবশ্যই ভালোভাবে আপনার খাতা মূল্যায়ন করবেন। সাদামাটা লিখে কখনোই ভালো নম্বর পাবেন না। লেখায় থাকতে হবে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সব তথ্য। অনেকের উত্তরপত্রে তথ্য কম, একই কথার পুনরাবৃত্তি ও ভুল তথ্য থাকে। এসব নম্বর কমিয়ে দেয়। ভুল বানান ও বাক্য, যতি চিহ্নের সঠিক ব্যবহার না থাকলেও নম্বর কম দেন পরীক্ষকরা। নম্বরের সঙ্গে উত্তরের পরিধির সামঞ্জস্য, আপডেট তথ্য ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা আপনাকে এগিয়ে রাখতে পারে।

বাংলায় হাতের লেখা ও উপস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার হাতের লেখা সুন্দর হলে ভালো। না হলেও খুব একটা অসুবিধা নেই। আসল বিষয় হচ্ছে, আপনি যা লিখছেন তা যেন স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ পরীক্ষক আপনার খাতা পড়তে পারলেই চলবে। লেখায় অতিরিক্ত কাটাকাটি, হাতের লেখা অতিরিক্ত বড় বা ছোট হলে পরীক্ষক বিরক্ত হতে পারেন। কোনোমতেই বাংলাকে দায়সারাভাবে নেবেন না। এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকুন। সাফল্য আসবেই।

॥ রিদওয়ান ইসলাম

কালের কণ্ঠ ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬

রুটিন মেনে সারাদিন

পড়াশোনা হোক কিংবা নতুন আইডিয়া নিয়ে মাতামাতি, সবকিছুকেই নিয়ে আসতে হয় রুটিনের ছকে।

রুটিন মেনে চলা কেবল ভালো ফলাফলের জন্যই প্রয়োজন নয়, বরং সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন গঠনের জন্যও প্রয়োজন। চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক তোমাদেরই কয়েকজন বন্ধু কিভাবে নিজের দৈনন্দিন কাজগুলো সমন্বয় করে।

সৌয়দা রিফাহ তাসফিয়া, আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের মূল দিবা শাখায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। শ্রেণিকক্ষে সে বেশ সক্রিয়, তবে শ্রেণিকক্ষের বাইরে বেশ ধীরস্থির। তুলনামূলক কম সময়ের মধ্যেই গুছিয়ে নিতে পারে দিনের সব লেখাপড়া। সকালে ঘুম থেকে উঠে কোচিং, সেখান থেকে ফিরে স্কুলের লেখাপড়া একটু ঝালিয়ে নেওয়াই সকালের কাজ। এরপর স্কুল, ফিরে ফ্রেশ হওয়া ও খাওয়া, এরপর পড়তে বসা আর রাত ১২টার মধ্যেই ঘুম।

গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে থাকে তাসফিয়া। বন্ধুরা ডাকে আইনস্টাইন। খেলাধুলার মধ্যেও আছে তার গণিতের নেশার প্রতিফলন। রুবিকস কিউব মেলানো তার প্রিয় ইনডোর গেম। যেকোনো বুদ্ধির খেলাতে আগ্রহ সমানতালে। ইলেকট্রনিকস বিনোদন বলতে এনিমের ভক্ত সে। তবে সমবয়সী অনেকের মতো সে সারাদিন এনিমেশন দেখে সময় কাটায় না। তার আগ্রহ বন্ধুদের আড্ডায় ও স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে। সব কিছু ম্যানেজ করতে চাপ আছে বটে, তবে এসব চাপের কোনো ছাপ যেন লেখাপড়ায় না পড়ে সেটি নিশ্চিত করে তাসফিয়া। এভাবেই তাসফিয়া নির্ভার রাখে চাকরিজীবী বাবা-মাকে। নিয়মমাফিক এ রুটিন ও শৃঙ্খলার মাধ্যমেই একদিন

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হতে চায় সে।

ক্যামব্রিয়ান কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির কমার্স বিভাগের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী শাফিন আহমেদের রুটিনে লেখাপড়ার প্রাধান্যই বেশি। খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস শাফিনের। সকাল ৫টায় ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়া তার প্রথম কাজ। এরপর কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি। তবে ৬টার মধ্যেই পুরোপুরি বিছানা ছাড়ে শাফিন। এরপর কলেজের পড়ার রিভিশন চলে। কলেজ শুরু হয় সকাল ৮টায়। ক্লাস চলে বিকেল ৩টা পর্যন্ত। কলেজেই দুপুরের খাবার সেরে নেয় শাফিন। ৩টায় কলেজ শেষ হলে বাসায় এসে এক ঘণ্টার ঘুম। এরপর গৃহশিক্ষক আসেন। কোচিংয়ে যায় না। গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠ শেষে বিকেলে খেলাধুলার জন্য বের হয়। ইলেকট্রনিকস গেমসের চেয়ে আউটডোর খেলাধুলাই বেশি টানে। শীতকালীন খেলার মধ্যে শাফিনের প্রিয় ব্যাডমিন্টন। খেলা শেষে বাসায় এসে হাতমুখ ধুয়ে ডুবে যায় বইয়ের জগতে। এক দিনে অনেক পড়ার চেয়ে প্রতিদিন অল্প অল্প পড়ায় বিশ্বাসী শাফিন। তাই দিনের পড়া দিনেই শেষ করে ১২টার মধ্যেই ঘুম। বাইরে আড্ডা দেওয়া হয় না খুব একটা। এইচএসসি পরীক্ষার দেরি নেই। তাই লেখাপড়াই এখন রুটিনের পুরোটা সময়।

এ তো গেল ফার্স্ট গার্ল আর ফার্স্ট বয়দের কথা। কিন্তু বাকিদের রুটিন? অনেকেই আছে যারা আসলে রুটিনের ধারও ধারে না। তারা কি সত্যিই রুটিন মানে না? তারাও কিন্তু নিজেদের অজান্তে একটা রুটিন অনুসরণ করছে। সেই রুটিনে হয়তো ভিডিও গেমস বা বাইরে আড্ডা দেওয়ার পরিমাণটা একটু বেশি, তবে রুটিন আছে ঠিকই। এখন তারা কী করবে? যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মেইন-এর এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বিশ্বের তাবৎ সৃজনশীল মানুষ ও বড় বড় বিজ্ঞানীরা মোটেই এলোমেলো জীবন কাটাতেন না। বরং তাঁরা কড়া রুটিন মেনে চলতেন এবং যেকোনো কিছু–সেটা গিটার শেখা হোক বা ক্রিকেট খেলা বা কঠিন কোনো বিষয়ে পড়াশোনা, রুটিন লাগবেই। আর সেই রুটিনটাকে রাখতে হবে বিক্ষেপমুক্ত। মানে এটা-ওটা যেন হুট করে মনোযোগ নষ্ট না করে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে এর উল্টোটাও সত্য, মানে একটা সুন্দর রুটিন থাকলে অন্য কিছু সহজে উড়ে এসে জুড়ে বসে কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। তোমার রুটিনে যদি লেখা থাকে বিকেল ৪টার দিকে আধা ঘণ্টা পত্রিকা পড়তে হবে, তখন ওই সময় দেখবে আর ফেসবুকে বসতে ইচ্ছে করবে না।

শিক্ষার্থীর জীবনে দুটি রুটিন। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, আরেকটি এর বাইরের। স্কুলের রুটিন নিয়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ মো. আবু সাঈদ বলেন, 'আমাদের স্কুলের রুটিন সম্পর্কে নির্দেশনা দেয় এনসিটিবি। সেই আঙ্গিকেই আমরা রুটিন তৈরি করি। তবে ওই রুটিনে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির জন্য সময় বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। কেবল লেখাপড়া করে কেউ মেধাবী হয় না।'

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন বলেন, 'একটি রুটিন শিক্ষার্থীদের হাইপার-অ্যাক্টিভিটি, মনোযোগহীনতা, অতিচঞ্চলতা এসব কমাতে সাহায্য করে। ভবিষ্যতে এ রুটিনটাই তাদের জীবনের নিয়ম হয়ে ওঠে। এতে শারীরিক, মানসিকের পাশাপাশি সামাজিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। তবে প্রথমত, শিক্ষার্থীর ডেইলি রুটিন কেবল শিক্ষার্থীর জন্য করলেই হবে না। শিক্ষার্থীর রুটিনের বিপরীতে যেন পরিবারের অন্যরা কিছু না করে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। যেমন–সন্তানকে বলা হলো তুমি রাত ৮টার মধ্যে খাবে, কিন্তু বাবা খাচ্ছেন রাত ১২টায়, সন্তানকে বলবেন ভোরে ঘুম থেকে উঠবে, কিন্তু মা উঠবেন ১১টায়; এমন হলে হবে না। সন্তানকে বলা হয় তুমি মোবাইল বেশি ব্যবহার করবে না, কম্পিউটারে বেশিক্ষণ থাকবে না, কিন্তু দেখা যায় পরিবারের অন্যরা সারাদিন পড়ে থাকে ফেসবুকে; এমন হলে কিন্তু উপদেশ ও প্রয়োগে একটি গ্যাপ তৈরি হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর ডেইলি রুটিন তৈরিতে অবশ্যই তার মতামতের গুরুত্ব দিতে হবে। তার সঙ্গে আলোচনা করেই রুটিন বানাতে হবে। কিছু চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। প্রতিটি শিশুর সক্ষমতা আলাদা। তাই আগে সন্তানের সঙ্গে কথা বলবেন যে তুমি কখন কতক্ষণ পড়তে চাও, কখন কী করতে চাও। এর ভিত্তিতে রুটিন তৈরি করবেন। এভাবে রুটিন তৈরি হলে এর ওপর শিক্ষার্থীর এক ধরনের দায়বদ্ধতা আসবে। রুটিন থেকে সে তখন নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারবে না।'

সন্তানকে বলা হয় তুমি মোবাইল বেশি ব্যবহার করবে না, কম্পিউটারে বেশিক্ষণ থাকবে না, কিন্তু দেখা যায় পরিবারের অন্যরা সারাদিন পড়ে থাকে ফেসবুকে; এমন হলে কিন্তু উপদেশ ও প্রয়োগে একটি গ্যাপ তৈরি হবে।

রুটিনে যা থাকতে হবে

ডা. হেলাল বলেন, রুটিনকে কেবল পাঠ্যবই পড়াকেন্দ্রিক করলে হবে না। অবসর, খেলাধুলা, পাঠ্য বইয়ের বাইরে বই, বিনোদনও থাকবে। আর একটি সময় রাখা যায় নিজের খেয়ালখুশি মতো কিছু করার জন্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আউটডোর অ্যাক্টিভিটি রাখা।

বাইরের কাজকর্ম কতটুকু?

ডা. হেলাল বলেন, বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে অল্প হলেও নিয়মিত যেন থাকে। একদিন অনেকক্ষণ খেললাম বা হাঁটলাম, পরে পাঁচ দিন বেরই হলাম না, এমন হলে লাভ নেই। শহর ও গ্রামের বাস্তবতা ভিন্ন। তবে প্রতিদিন অন্তত কিছুটা হলেও আউটডোর অ্যাক্টিভিটি জরুরি। দিনে ৪০ থেকে ৫০ মিনিট হলেই যথেষ্ট।

ডা. হেলাল নিজেও দুই সন্তানের বাবা। তাঁর দুটি সন্তানই লেখাপড়া করে। একজন ক্লাস সেভেনে ও অন্যজন পড়ে ক্লাস টুতে। তিনি চান না সন্তানের রুটিনে প্রভাব বিস্তার করতে। তবে সন্তানের সঙ্গে নিয়মিত সময় কাটাতে ভোলেন না। নিজেদের রুটিন তৈরি করায় সন্তানদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

■ মিজানুর রহমান

কালের কণ্ঠ ৩০ নভেম্বর ২০১৬

প্রকল্প সংবাদ

মেধা লালন প্রকল্প'র ২০১৬ ব্যাচের অবহিতকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিয়মিত কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এইচডিএফ) মেধা লালন প্রকল্প'র ২০১৬ ব্যাচের নব নির্বাচিত সদস্যদের জন্য গত ০৯-১০ মার্চ ২০১৭ এক অবহিতকরণ কর্মসূচির আয়োজন করে। কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার 'পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট' মিলনায়তনে। ফাউন্ডেশনের সঙ্গে প্রকল্পভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিতি, সেই সাথে তাদের নিজেদের মধ্যে পরিচিতি বাড়ানো, এবং মেধা লালন প্রকল্প'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করাই ছিল এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে মোট ৫৮ জন সদস্য, ২৭ জন ছাত্রী এবং ৩১ জন ছাত্র অংশ নেয়।

দুদিনব্যাপী এ কর্মসূচির প্রথম দিন, ০৯ মার্চ (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠিত হয় রেজিস্ট্রেশন, পরিচয়পর্ব, অনুষ্ঠান সম্পর্কিত উপকরণ বিতরণ, সাধারণ আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান পর্ব। প্রধান কর্ম-অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১০ মার্চ (শুক্রবার)। প্রথম দিন অনুষ্ঠানের শুরুতে সাধারণ আলোচনা পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এইচডিএফ'র নির্বাহী পরিচালক জনাব তাসনিম হাসান হাই। স্বাগত বক্তব্যে তিনি প্রকল্প'র নবীন সদস্যদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান; ফাউন্ডেশন এবং মেধা লালন প্রকল্পসহ সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইতিহাস তুলে ধরেন এবং সংস্থার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা প্রদান করেন। এর পরপরই ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার নাসিমা সুলতানা প্রকল্পের ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্য পালনীয় নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এর পরবর্তী পর্বে ছিল 'এইচএসসি পরীক্ষায় কীভাবে ভালো ফল অর্জন করা যায়' সে বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা। প্রকল্প'র বর্তমান মেধাবী ছাত্রদের কয়েকজন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন–২০০৭ ব্যাচের সদস্য, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন থেকে গ্র্যাজুয়েট সায়মা সুলতানা জবা; ২০১২ ব্যাচের সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র মো. রকিবুজ্জামান রকি এবং ২০১৩ ব্যাচের সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্র মির্জা হাফিজ। এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো ফল লাভের লক্ষ্য স্থির করে পড়ালেখার মধ্য দিয়ে ছাত্রজীবনের এই পর্যায়ের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য নবীনদের দিক-নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি যেকোনো ধরনের পরামর্শের প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতার আশ্বাসও প্রদান করেন উপস্থিত বক্তাগণ।

পরদিন প্রধান কর্ম-অধিবেশনের শুরুতে দিনব্যাপী কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব গোপাল চন্দ্র বৈরাগী। এ কর্ম-অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি বক্তাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের ওপর আলোচনা ও বক্তব্য উপস্থাপন করেন। প্রথমেই ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক দুটি আলোচনা পর্বের আয়োজন করা হয়। মেয়েদের জন্য নির্ধারিত পর্ব 'ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা' বিষয়ে আলোচনা করেন *স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ* এর পাবলিক হেলথ্ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. নাতাশা খুরশিদ। সাধারণ স্বাস্থ্য-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে মেয়েদের বিশেষ স্বাস্থ্যসমস্যা এবং পরিবারের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে পরিচ্ছন্নতা সচেতন হয়ে ওঠার দিক-নির্দেশনা প্রদানই ছিল এই আলোচনার লক্ষ্য। অপরদিকে ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত পর্ব 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ নাগরিকত্ব' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন *ব্র্যাক* এর প্রাক্তন জেন্ডার স্পেশালিস্ট জনাব তানভির আহমেদ সৈকত। পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বৃহত্তর সমাজে মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে সম্মান বজায় রাখার প্রতি ছেলেদের সচেতন করা এবং যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াসে এই বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে। এরপর 'আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: একটি পর্যালোচনা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, *সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সায়েন্স* এর চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম।

মানবজাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ধারায় বিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রভাবের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মানব সভ্যতার বিবর্তন, মহাবিশ্ব প্রভৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরার পাশাপাশি আধুনিক বিশ্বের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সঠিক এবং নিবিড় ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞান-ভান্ডার সমৃদ্ধকরণে সকলের সচেতন প্রয়াসের প্রতি আলোকপাত করেন। এই পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। ব্যক্তিক পর্যায়ে আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মশুদ্ধি, নৈতিকতা, একাগ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, নিয়ন্ত্রণক্ষমতা, পারদর্শিতা–এসব গুণাবলীর উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে দায়বদ্ধতা এবং সেই সাথে বর্তমান সময়ের উন্নয়নের ধারাকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি এবং তার সমন্বিত প্রয়োগের প্রতি আলোকপাত করেন তিনি। এর পরবর্তী ভাগে 'How to Learn Better English' বিষয়ে আলোচনা করেন *ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ* এর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক রিংকু সাহা। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে, নিয়মিত ও নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষায় পড়া, শোনা, লেখা এবং বলা–এই মৌলিক বিষয়গুলোতে কীভাবে পারদর্শী হয়ে ওঠা যায় সে সম্পর্কে বাস্তব উদাহরণ সহকারে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি। আলোচনা পর্বের শেষ ভাগে 'নৈতিকতা ও শিক্ষা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের কোষাধ্যক্ষ এবং মেধা লালন প্রকল্প কমিটি'র চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হামিদা আখতার বেগম। মানবজীবনে নৈতিকতার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা, এর শিক্ষণ প্রক্রিয়া, সাধারণ শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার পার্থক্য তুলে ধরার পাশাপাশি সমাজে নৈতিকতার চর্চা সক্রিয় রাখার ক্ষেত্রে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকার গুরুত্ব উদাহরণ সহকারে তুলে ধরেন তিনি।

প্রধান কর্ম অধিবেশনের আলোচনা পর্ব শেষে অনুষ্ঠিত হয় মেধা লালন প্রকল্প'র প্রাক্তন সদস্যদের অংশগ্রহণে 'সম্মিলন সভা'। এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের কোষাধ্যক্ষ এবং TAS Committee-এর চেয়ারম্যান ড. হামিদা আখতার বেগম। প্রকল্প'র প্রাক্তন সদস্যদের মধ্যে এতে যোগ দেন প্রকল্প'র ১৯৮৮ ব্যাচের সদস্য, *বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেল্থ সায়েন্সেস হসপিটাল ঢাকা*-এর সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. অসিত মজুমদার এবং *স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি.*-এর ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনভেন্টরি কন্ট্রোল বিভাগের ম্যানেজার কাজী নজরুল ইসলাম; '৯৪ ব্যাচের সদস্য, *ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বংলাদেশ* এর রিসার্চ এন্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যনেজার আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া; '৯৫ ব্যাচের সদস্য, *ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া*-এর রিলেশনশিপ ম্যানেজার দয়াল দত্ত; '৯৬ ব্যাচের সদস্য, *বাংলাদেশ ব্যাংক* এর হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট এর ডেপুটি ডিরেক্টর নুসরাত জাহান। প্রাক্তন এই সদস্যরা নবীনদের উদ্দেশ্যে তাঁদের সাফল্যের পেছনের সাধনার গাঁথা তুলে ধরেন; সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনকে আলোকবর্তিকা রূপে উল্লেখ করে তাঁরা এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। নবীনদের উদ্দেশ্যে–জীবনে সফলতা অর্জন এবং নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলবার বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন তাঁরা; সেই সাথে ফাউন্ডেশন থেকে নেয়া শিক্ষাঋণের গুরুত্ব উপলব্ধি এবং তা যথাসময়ে ফেরত প্রদানে তৎপরতার বিষয়টিতেও তাঁরা আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের শেষাংশে অতিথিবৃন্দের কাছ সুদমুক্ত শিক্ষাঋণের প্রথম কিস্তির চেক গ্রহণ করে প্রকল্প'র নবীন ছাত্র-ছাত্রীরা। নবীন সদস্যরা ফাউন্ডেশনের এই আয়োজন সম্পর্কে তাদের মনোভাব–আগ্রহ উদ্দীপনার বিষয়টি প্রকাশ করে তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। প্রচেষ্টা ও সাধনা দ্বারা তারাও একদিন উন্নতির শিখরে পৌঁছবে, অনুসরণীয় আদর্শ রূপে নিজেদের গড়ে তুলবে, সেই প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

আমরা গর্বিত

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের জেনারেল বডি'র সম্মানিত সদস্য প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী দেশের 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এবছর বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত অন্যতম জাতীয় ও বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পদক 'একুশে পদক ২০১৭' লাভ করেছেন। তাঁর এই অর্জনে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রকৌশলী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ১৯৪২ সালের ১৫ নভেম্বর সিলেট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা প্রকৌশলী আবিদ রেজা চৌধুরী এবং মা হায়াতুন নেছা চৌধুরী। জামিলুর রেজা চৌধুরী 'সেইন্ট গ্রেগরিজ স্কুল' থেকে ১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। ১৯৫৯ সালে 'ঢাকা কলেজ' থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর ১৯৬৩ সালে প্রথম বিভাগে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন 'আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ' (বর্তমানে 'বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়') থেকে। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগে। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে বার্মাশেল বৃত্তি নিয়ে চলে যান ইংল্যান্ডে; সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি করেন, অ্যাডভান্সড্ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। ১৯৬৮ সালে কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন অব হাইরাইজ বিল্ডিং বিষয়ের উপর পিএইচডি করেন। পিএইচডি শেষ করে দেশে ফিরে বুয়েটের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এরপর ১৯৭৩ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৭৬ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পান। ২০০১ সাল পর্যন্ত বুয়েটে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন; কখনও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে, এবং ডিন হিসেবে। এছাড়া, ২০০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ আর্থকোয়েক সোসাইটি এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। অধ্যাপক চৌধুরী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনের সফটওয়্যার রপ্তানি এবং আইটি সার্ভিস রপ্তানি-সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। তিনি প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি টাস্কফোর্সের একজন সদস্য। তিনি যুক্তরাজ্যের একজন চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার; বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির ফেলো। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন যুক্তরাজ্যের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ফেলো। এছাড়া তিনি আরো অসংখ্য

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও উপদেষ্টা/পরামর্শক হিসেবে জড়িত আছেন। বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ থেকে যখন অনেক তরুণ প্রকৌশলী দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন, তখন তিনি বাংলাদেশে থেকেই কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন; এমনকি দুনিয়ার বিখ্যাত সিয়ার্স টাওয়ার-এর নকশা প্রণেতা বাংলাদেশের স্থপতি ড. এফ আর খান অধ্যাপক চৌধুরীকে তাঁর সঙ্গে কাজ করার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরবর্তী যত বড় বড় অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে, প্রতিটির সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা রয়েছে। যমুনা বা পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রক্রিয়ার সঙ্গেও মি. চৌধুরী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৭৭ সালে তাঁর ওপর সিসমিক জোনিং ম্যাপ এবং ভূমিকম্পরোধী ভবনের বিল্ডিং কোডের আউট লাইন তৈরির দায়িত্ব বর্তায়, যা তিনি দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করেন। তাঁর সেই ভূমিকম্পরোধী জোনিং ম্যাপ এবং বিল্ডিং কোডের আউটলাইন মেনেই ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত নির্মাণ করা হয় বড় বড় ইমারত।

দেশে-বিদেশে বিভিন্ন অবদানের জন্য সমাদৃত জামিলুর রেজা চৌধুরীর ৬৫টি গবেষণা-প্রবন্ধ রয়েছে। তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মাননার মধ্যে রয়েছে: একুশে পদক (২০১৭), শেলটেক পুরস্কার (২০১০), বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন স্বর্ণপদক (১৯৯৮), ড. রশিদ স্বর্ণপদক (১৯৯৭), রোটারি সিড অ্যাওয়ার্ড (২০০০), লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল (ডিস্ট্রিক্ট ৩১৫) স্বর্ণপদক, জাইকা রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ। তিনিই একমাত্র বাংলাদেশি যিনি একটি ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশল বিষয়ের ওপর এ ধরনের ডিগ্রি পেয়েছেন।

ওষুধ কোম্পানিতে হাজারো চাকরির সুযোগ

দেশে ওষুধ কোম্পানিগুলোর প্রসার হচ্ছে দিনে দিনে। বাংলাদেশ থেকেই বিশ্বের ৫০ থেকে ৬০টি দেশে ওষুধ যাচ্ছে। ওষুধ তৈরি, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে শুরু করে বাজারজাত করাসহ বিপুল কর্মযজ্ঞে অনেক মানুষ কর্মরত আছেন। এই শিল্পে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ফার্মাসিস্টদের মতো বিশেষায়িত পদ যেমন আছে, তেমনি যেকোনো বিষয় থেকে পাস করা ব্যক্তির জন্যও চাকরি আছে এখানে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠিত একেকটি ফার্মায় বিভিন্ন পর্যায়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার লোক কাজ করছেন। ওষুধ কোম্পানিগুলোতে কোন কোন ধরনের চাকরি আছে–এসব নিয়ে বিস্তারিত বলেছেন স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের মানবসম্পদ বিভাগের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক মো. ইউনুছ আলী, জেনারেল ফার্মার মানবসম্পদ বিভাগের উপব্যবস্থাপক দিলীপ কুমার সিকদার ও ইনসেপটা ফার্মার মানবসম্পদ ব্যবস্থাপক মো. এনায়েত হোসেন।

মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ

ওষুধ কোম্পানিগুলোর প্রসার হচ্ছে দিনে দিনে। কোম্পানিগুলো নিয়মিত নতুন নতুন ওষুধ বাজারে নিয়ে আসছে। আর আগের ওষুধ তো আছেই। এসব ওষুধের পরিচিতি চিকিৎসকদের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভদের (এমআর)। সারা বছরই এ পদে লোক নেয় ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো। ওষুধ সম্পর্কে চিকিৎসকদের অবগত করার কাজে নিয়োজিত থাকেন এই পেশার মানুষ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কী ওষুধ বানাচ্ছে, কেন ও কীভাবে সেই ওষুধগুলো কাজ করবে, আগের ওষুধের সঙ্গে নতুন ওষুধের পার্থক্য কী প্রভৃতি তথ্য জানানোই তাঁদের কাজ। ওষুধের বাজারটা অনেক বড়, তাই এই পেশায় জনবলের চাহিদাও অনেক বেশি। ওষুধের বাজারের আওতা বেড়ে যাওয়া, কোম্পানিগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া, শূন্য পদ সৃষ্টি হওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে প্রতিবছর অন্তত ১০ হাজার দক্ষ জনবলের প্রয়োজন হয় এই খাতে। এই পদের চাকরিপ্রার্থীর অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতকোত্তরদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আগে স্নাতক পর্যন্ত বিজ্ঞান বিষয় থেকে পাস করা বাধ্যতামূলক থাকলেও বর্তমানে যেকোনো বিষয় থেকে স্নাতক পাসদের চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রেও এসএসসি পর্যন্ত বিজ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক হলেও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান যোগ্য প্রার্থী পেলে সেটাও ছাড় দেয়।

বিপণন বিভাগ

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক ওষুধগুলো দেশে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সরকারি অনুমোদন নিয়ে একটি পণ্যের গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলো চিকিৎসকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন এই বিভাগের কর্মীরা। আর এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন মেধাবী ফার্মাসিস্ট ও চিকিৎসক, যাঁদের আছে রোগ এবং রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত ওষুধ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান। বিপণন বিভাগের

মধ্যে আছে মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স, মার্কেটিং রিসার্চ বিভাগ।

মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স বিভাগে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা সবাই চিকিৎসাবিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস করা চিকিৎসক। এখানে কর্মরতরা মূলত সায়েন্টিফিক বা বৈজ্ঞানিক সেমিনারের আয়োজন করা, ওষুধের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা, চিকিৎসকদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং ক্লিনিক্যাল মিটিং করা প্রভৃতি করে থাকেন। অন্য চিকিৎসকদের সঙ্গে কাজ করার জন্য যাতে চিকিৎসকদের ভাষা বা চাহিদা ভালোমতো বুঝতে পারা যায়, তাই এই বিভাগে চিকিৎসকেরাই কর্মরত থাকেন।

এ ছাড়া ড্রাগ রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স এই বিভাগের মধ্যে। এর কাজ হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নানা ধরনের অনুমতি নেওয়া। সেই বিষয়গুলো এই বিভাগের কর্মরতরা দেখেন। বিপণন জরিপ হচ্ছে এই বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর কাজ হচ্ছে বিভিন্ন চিকিৎসকের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন জরিপ করে কোন ধরনের ওষুধ চিকিৎসকেরা দেন, তা নথি আকারে তৈরি করা। এখানে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা মার্কেটিং রিসার্চ রিপ্রেজেনটেটিভ নামে পরিচিত। এ ছাড়া বিপণন বিভাগে মার্কেটিং অ্যাশুরেন্স ও ক্রিয়েটিভ ডিজাইন নামের আলাদা আলাদা শাখাও আছে। এ ছাড়া প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগের কাজ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের তৈরি ওষুধের বাজার আরও প্রসারিত করা, নতুন ওষুধ বাজারে নিয়ে আসা এবং মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এখানে ফার্মেসি, এমবিবিএস, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটরা কাজ করেন।

মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ

এই বিভাগকে কোয়ালিটি কন্ট্রোল বা কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স বিভাগ বলা হয়। এই মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগের কাজ হচ্ছে কাঁচামাল থেকে শুরু করে তৈরি হওয়া ওষুধের গুণগত মান ঠিক আছে কি না, তা যাচাই-বাছাই করা। এই বিভাগে মাইক্রোবায়োলজি, ফার্মাসি, বায়োকেমিস্ট্রি বা কেমিস্ট্রি থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটরা কাজ করেন।

প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট বিভাগ

এই বিভাগের কাজ হচ্ছে ওষুধের উন্নয়নে নানান কাজ করা। যে ওষুধ বাজারে আনা হবে, তার স্থায়িত্ব বা মান ঠিক আছে কি না, কিংবা আবহাওয়ার সঙ্গে কতটুকু মানানসই হবে–এ বিষয়গুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। ওসব ওষুধের নথিপত্র তৈরি করা। এখানে কর্মরতদের বিজ্ঞানী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এখানে মূলত কাজ করেন ফার্মেসি থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটরা।

প্রোডাকশন বিভাগ

কোনো ওষুধ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকাই প্রোডাকশন ফার্মাসিস্টদের কাজ। এখানেও কাজ করেন ফার্মেসি থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটরা।

ব্যবসায়ী শাখা

এই শাখাকে ইংরেজিতে কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট বলা হয়। এঁদের কাজ অনেকটা ব্যবসায়িক কার্যকলাপে যুক্ত হলেও এখানে ফার্মাসিস্ট, প্রকৌশলী বা ব্যবসায় শিক্ষা থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটরা নিযুক্ত থাকেন। ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে এমন নানা পণ্যের কাঁচামালসহ অন্যান্য কেনাকাটা করাই এই বিভাগের কাজ। ফার্মাসিস্টরা ওষুধের কাঁচামাল কী কী লাগে, সেটা ভালো বোঝেন বলে এটি কেনাকাটায় তাঁদের দরকার।

তেমনিভাবে ওষুধ তৈরির বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার ভালো বোঝেন প্রকৌশলীরা। এজন্য এই বিভাগে তাঁদের দরকার। সেই সঙ্গে ব্যবসায়িক বিভিন্ন বিষয় যেহেতু ব্যবসায় শিক্ষা থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটরা ভালো বোঝেন, তাই এই বিভাগে তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়।

প্রকৌশল বিভাগ

ওষুধ তৈরির পুরো বিষয়টিতে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। এগুলোর একেকটির কাজ একেক ধরনের। আর এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা বা দেখভাল করার জন্য নানা প্রকৌশলীর দরকার হয়। এই বিভাগে শুধুই প্রকৌশল বিভাগ থেকে পাস করেন এমন গ্র্যাজুয়েটরাই নিয়োজিত হন। মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের প্রকৌশলীদেরই এখানে বেশি চাহিদা।

বিক্রয় প্রশাসন

এই বিভাগের কাজ হচ্ছে পুরো বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ লোকবল আছে, তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা–ওষুধ বিক্রি হওয়ার পরিমাণ, বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত জনবলের সফলতা বা দুর্বলতা নির্ণয় করা বা পুরো হিসাব তৈরি রাখা।

অর্থ ও হিসাব শাখা

অন্য সব প্রতিষ্ঠানের মতোই ওষুধ তৈরি প্রতিষ্ঠানেও হিসাব শাখা থাকে। এখানে মূলত সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে বিবিএ বা এমবিএ থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটদের কাজ। এখানে অনেক জটিল আর্থিক বিষয়গুলো দেখভাল করার জন্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিয়োগ করা হয়।

মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ

এই বিভাগের মধ্যে থাকে দুটি আলাদা বিভাগ। একটি হচ্ছে হিউম্যান রিসার্চ প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, অপরটি হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং বিভাগ। এসব বিভাগের কাজ হচ্ছে লোকবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, বেতনসহ কর্মী আর কর্মকর্তাদের নানা দাপ্তরিক কাজ দেখাশোনা করা।

আন্তর্জাতিক ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ

দেশের বাইরেও যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের দেশি ওষুধ কোম্পানির ওষুধ। ৫০ থেকে ৬০টি দেশে যাচ্ছে এ দেশে তৈরি ওষুধ। এই বিভাগের কাজ হচ্ছে দেশের বাইরে প্রতিনিধি নিয়োগ, বিভিন্ন দেশে ওষুধ বিক্রির অনুমতি নেওয়া প্রভৃতি। এখানে ফার্মেসি ও ব্যবসায় শাখা থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটরা কাজ করেন।

■ মোছাব্বের হোসেন
প্রথম আলো ১১ মার্চ ২০১৬

Nobin Back To Back Forma 04

বদরুল স্যার

বিকাশ কুমার কর্মকার
সদস্য নং ৭৯/২০০৭ [এইচএসসি]

বদরুল স্যার চশমার ফাঁক দিয়ে একবার আমার দিকে তাকালেন তারপর রেজিস্টার খাতাটি বন্ধ করতে করতে বললেন, 'কী বললি?'

'স্যার আমার নাম ডাকলেন না?'

'কী নাম?'

'বিকাশ, বিকাশ কুমার কর্মকার।'

দুবার পৃষ্ঠা উল্টিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এইট এ কোন সেকশনে ছিলি?'

'D সেকশন।' লজ্জিত হয়ে বললাম।

'ওহ্হ্হ্' স্যার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'তা অংকে আর বিজ্ঞানে কত পেয়েছিলেন?'

'...মানে স্যার...ঐ একটু অসুস্থ ছিলাম। মানে...অংকে ৪, বিজ্ঞানে ৩৯...।'

'অসুস্থ ছিলেন? সায়েন্স খুব কঠিন। অসুস্থ মানুষের জন্য সায়েন্স না, যা হারামজাদা C সেকশনে যা।' স্যার মেজাজ গরম করে বললেন।

ছলছল চোখে ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে এলাম। পুরো ক্লাসে ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠল। আমার জিদ বেড়ে গেল। যে করেই হোক সায়েন্স পড়ব। সাতদিন ঘোরাঘুরি করে এলাকার বড়ভাইদের সাহায্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত ভর্তি হলাম নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে।

রেজাল্ট বের হলো। পদার্থ, রসায়ন, গণিতে ফেল। উচ্চতর গণিতে ডাবল জিরো। কয়েকজন বন্ধু মিলে কম্পিউটারের দোকানে বসে এক অমর রেজাল্টশিট তৈরি করলাম। প্লেস দিলাম চতুর্থ। বাসায় আমার কদর বেড়ে গেল। স্কুলেও কেউ বুঝতে পারল না।

দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার আগে বলা হলো যাদের রেজাল্ট খুবই খারাপ তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে দেয়া হবে না। ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করলাম। আবারও বড় ভাইদের ক্ষমতা দেখিয়ে প্রায় জোর করে রেজিস্ট্রেশন করলাম। কিন্তু আসল ঘটনা ফাঁস হয়ে গেল।

বাসা থেকে আমার প্রতি শাসন বেড়ে গেল। উঠতে বসতে সবসময়ই গালমন্দ শুনতে শুনতে কান ঝালপালা হয়ে গেল। বাসায় থাকা আমার জন্য দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়াল। সারাদিন বাইরে ঘোরাঘুরি করতাম। রাতে এসে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম।

দিন গড়াতে লাগল। একদিন স্কুল থেকে বাসায় ফিরছি। বাইরে তখন ঝুম বৃষ্টি। পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল, 'এই ছেলে, এই...।'

তাকিয়ে দেখি আমাদের বদরুল স্যার। সামনে এসে বললেন, 'বৃষ্টিতে ভিজছিস কেন? ঠান্ডা লাগবে তো। এদিকে আয়।'

পরম মমতায় আমাকে তাঁর ছাতার মধ্যে টেনে নিলেন।

মিনিট পাঁচেক স্যারের সাথে হাঁটলাম। আমার করুণ পরিণতি নিয়ে অনেক আফসোস করলেন। যাবার সময় বললেন, 'সবসময় honest থাকবি। কাউকে ঠকাবি না। আর বাবা-মা কে কখনো ফাঁকি দিস না। লেখাপড়া করিস না কেন? লেখাপড়া কি খুব কঠিন? লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়া কঠিন। সামান্য লেখাপড়া করতেই যদি ভয় পাস, মানুষ হবি কেমন করে?' বৃষ্টির জলধারা আমার চোখের জলকে লুকিয়ে রাখল।

এর দুদিন পরেই স্যার হার্টঅ্যাটাকে মারা যান। স্যারের মৃত্যু সহজে মেনে নিতে পারলাম না। কেমন যেন হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে বদলে যেতে শুরু করলাম। এখনো ঝুম বৃষ্টিতে যখন ক্যাম্পাসে একাকী হাঁটাহাঁটি করি শুনতে পাই কে যেন পেছন থেকে ডেকে বলছেন, 'অ্যাই ছেলে অ্যাই, বৃষ্টিতে ভিজছিস কেন? ঠান্ডা লাগবে তো!'

পুন:প্রকাশ

মোসাদ্দেকের জ্বালানি সাশ্রয়ী চুলা

উদ্ভিদ নিধন ও পরিবেশ দূষণ কমিয়ে জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং অল্প সময়ে স্বল্প খরচে রান্নার চুলা উদ্ভাবন করেছেন দিনাজপুরের মোসাদ্দেক। এ চুলার বহুবিধ সুবিধা থাকায় একে আদর্শ চুলাও বলা হচ্ছে। এ চুলায় লাকড়ি, কয়লা বা গ্যাসসহ সবধরনের জ্বালানি ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়াও সোলার সিস্টেম, মিউজিক প্লেয়ার, গরমে বাতাস পেতে পাখা, রিমোট কন্ট্রোল সংযোগের ব্যবস্থা থাকছে।

দিনাজপুর আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. মোসাদ্দেক হোসেন উদ্ভাবিত বিশেষ ধরনের রান্নার চুলা জাতীয় পর্যায়ে ইতিমধ্যে পুরস্কৃত হয়েছে। বেশ সাড়া পড়েছে এ চুলা নিয়ে।

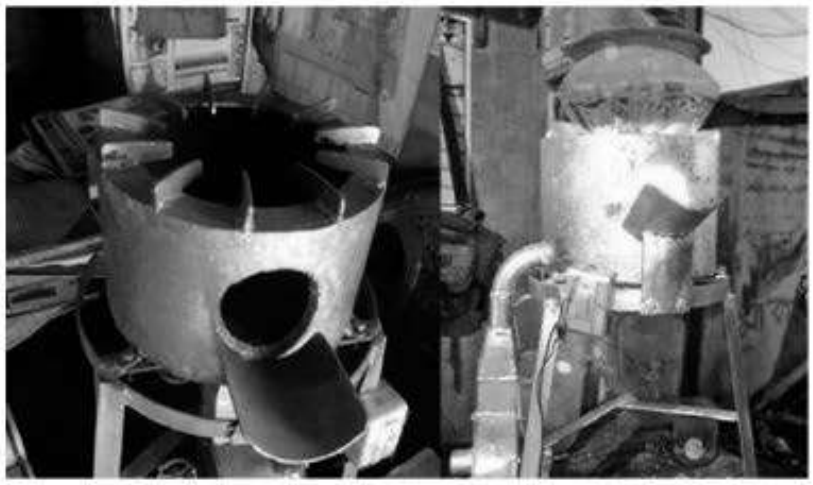

মোসাদ্দেক জানান, চুলায় শুধু রান্না করার জন্য হলে মাত্র ২০০ থেকে ৩০০ টাকার জ্বালানি খরচে পাঁচ সদস্যের পরিবারে পুরো মাসে রান্না করা যায়।

চুলাটির সাশ্রয়ীর কারণ ব্যাখ্যা করে জানান, চুলাটিতে বাইরে থেকে ৬-১২ ভোল্টের মোটর দ্বারা বাতাস প্রদান করে আগুন জ্বালাতে সহায়ক অক্সিজেন সরবরাহ করার কারণে জ্বালানি খুব সহজে পোড়ে এবং জ্বালানি অপচয় রোধ হয়। চুলাটি ইস্পাত নির্মিত হওয়ায় তাপধারণ ক্ষমতা বেশি। এ ছাড়া চুলাটিতে জ্বালানি পোড়ানোর পরে যে তাপ নির্গত করে তা চুলাটির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকার কারণে অতিরিক্ত তাপ বাইরে নির্গত হয় না ফলে দ্রুত রান্না হয়।

তিনি আরও জানান, ১ কেজি চালের ভাত রান্নায় এ চুলায় ১৮-২০ মিনিট লাগে, যেখানে সাধারণ চুলায় তা ৩০ মিনিটের বেশি লাগে। অতিরিক্ত বাতাস প্রদানের কারণে রান্নায় কালো ধোঁয়া ও কালি কম হয়। কাঠখড়ি, গোবরখড়ি, বাঁশখড়ি, চারকলসহ সকল প্রকার জ্বালানি পোড়ানো যায়।

এ ছাড়াও এ চুলায় ফেলে দেওয়া কাঠকয়লাও পোড়ানো যায়। কালো ধোঁয়া ও কোন প্রকার কালি ছাড়াই পরিবেশবান্ধব উপায়ে কাঠকয়লা পুড়িয়ে রান্না করা যায় এবং কাঠকয়লা সহজলভ্য হওয়ায় মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ টাকার কয়লায় এক মাস রান্না করা যায়। এ ছাড়াও একই চুলা দ্বারা জ্বালানির পাশাপাশি গ্যাস সংযোগ দিয়ে বোতলজাত গ্যাস দিয়েও রান্না করা সম্ভব।

চুলাটিতে অক্সিজেন সরবরাহে মোটর চালাতে বিদ্যুৎ অ্যাডাপ্টর, মোবাইল চার্জার বা টর্চলাইট ব্যাটারি স্বল্প ভোল্টেজে চালানো যায়। চুলাটি বিভিন্ন ধরনের ইস্পাত, ৬-১২ ভোল্টের মোটর, কন্ট্রোল সুইচ বোর্ড দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি এবং এটি তৈরিতে খরচ হয় মাত্র ২৫০০ টাকা। এ ছাড়া রান্নার সময় বাতাস, গান শোনা বা মোবাইল চার্জ দেওয়া যাবে এ স্বয়ংক্রিয় চুলায়।

তবে স্বয়ংক্রিয় ও আধুনিকায়ন করতে সোলার সিস্টেম, মিউজিক প্লেয়ার, গরমে বাতাস পেতে পাখা, রিমোট কন্ট্রোল সংযোগ করা সম্ভব। এসব সুবিধা নিতে খরচ হবে সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ৩৫০০ থেকে ৫০০০ টাকা।

মোসাদ্দেকের উদ্ভাবিত বিশেষ ধরনের চুলাটি গত বছরের জানুয়ারিতে ৩৬তম জাতীয় বিজ্ঞানমেলায় সিনিয়র ক্যাটাগরিতে দিনাজপুর জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার অর্জন করেছে।

এরপর ২০১৫ সালের ১০ মে রংপুর বিভাগীয় বিজ্ঞানমেলায় চ্যাম্পিয়ন ও জুলাইয়ে ঢাকায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে জাতীয় পর্যায়ে পঞ্চম স্থান অর্জন করে।

এ ব্যাপারে দিনাজপুর আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ খালেকুজ্জামান জানান, তার উদ্ভাবিত সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব চুলাটি দ্বারা কলেজ মাঠেও রান্না করে দেখেছি। এজন্য মোসাদ্দেক আঞ্চলিক, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার অর্জন করেছে। বেশ সাড়া ফেলেছে এ চুলাটি। ইতোমধ্যে চাহিদা বাড়ছে এ চুলার।

■ শাহ্ আলম শাহী
বিডিলাইভ২৪, ২১ ডিসেম্বর ২০১৬

দেশে বসে অ্যামাজনে আয়!

অনলাইন বিপণন ব্যবস্থা 'অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং' নিয়ে দেশের প্রথম প্রতিষ্ঠান মার্কেটেভার গড়ে তুলেছেন তরুণ উদ্যোক্তা আল-আমিন কবির। ফক্সনিউজ, এন্ট্রাপ্রেনার ডটকমের মতো আন্তর্জাতিক মাধ্যমেও প্রশংসিত হয়েছে তাঁর উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকেও পেয়েছেন বিশেষ পুরস্কার।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স সাইট অ্যামাজন (Amazon.com)। সাইটটিতে প্রতি মিনিটে গড়ে ৮৬ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য বিক্রি হয়। বিপণন কৌশলের অংশ হিসেবে 'অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম' নামে বিশেষ একটি সুবিধা আছে এ সাইটে। বিশ্বের যে কেউ এ প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে অ্যামাজন পণ্যের বিক্রি বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারেন। করতে পারেন আয়। এ প্রোগ্রামে যারা কাজ করেন তাদের বলা হয় অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার। অ্যামাজনে লাখো পণ্যের সম্ভার। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারদের তাই আয়ের সম্ভাবনাও বিস্তর। বিক্রির ওপর ভিত্তি করে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারদের কমিশন দেয় অ্যামাজন। যত বেশি ডলারের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন, আপনার কমিশন তত বাড়বে। মার্কেটাররা ৪ থেকে ৮.৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন পেয়ে থাকেন।

যেভাবে বিপণন

অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার জন্য একটি নিশ ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয়। নিশ সাইট মানে হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের প্রতি আগ্রহ আছে এমন ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে ওয়েবসাইট তৈরি করা। ধরুন আপনি সাইকেল বিক্রি করার জন্য একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলেন। এ ক্ষেত্রে আপনার ওই সাইটটি একটা নিশ সাইট, আর আপনার নিশ হচ্ছে সাইকেল। অ্যামাজনে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হিসেবে আয় করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে নিশ সাইট। মূল মডেলটি হচ্ছে, আপনি একটি নিশ সাইট তৈরি করবেন, এরপর ওই নিশ সাইটের জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) করবেন। ভালোমতো এসইও করলে গুগলে নির্দিষ্ট ফ্রেজ কিংবা কিওয়ার্ডে আপনার ওয়েবসাইটটি দেখা যাবে। সেখান থেকে আপনি প্রচুর ভিজিটর পাবেন, আপনার কাজ হচ্ছে ওই ভিজিটরকে অ্যামাজনে পাঠানো। এরপর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা ওই ভিজিটর অ্যামাজন থেকে যা-ই কিনবে, তার জন্য আপনি কমিশন পাবেন।

নিশ সাইট তৈরি

নিশ সাইট তৈরি করার জন্য কয়েকটি ধাপ রয়েছে।

পরিকল্পনা, নিশ এবং কিওয়ার্ড রিসার্চ : শুরুতে পরিকল্পনা করতে হবে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে আপনি কোন ধরনের পণ্য নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন। অ্যামাজনের লাখ লাখ পণ্যের মধ্য থেকে আপনি ইচ্ছেমতো এক বা একাধিক নিশ নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। তবে নিশ পছন্দ করেই কাজ শুরু করলে চলে না, একটি নিশ সাইটের মূল লক্ষ্য থাকে সার্চ ইঞ্জিন থেকে ভিজিটর আনা, আর তাই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের প্রথম ধাপ, কিওয়ার্ড রিসার্চ করেই নিশ চূড়ান্ত করতে হয়।

কিওয়ার্ড রিসার্চ : কিওয়ার্ড হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট Phrase বা Term, যেটি লিখে ব্যবহারকারীরা গুগলে তথ্য খুঁজে থাকেন। ধরুন আপনি Mountain Bike কিনবেন, আপনার টার্গেট হচ্ছে বাজারের সেরা মাউন্টেন বাইকটি কেনা। তাহলে আপনি গুগলে সার্চ করবেন Best Mountain Bike কিংবা Best Mountain Bikes লিখে। এখানে Best Mountain Bike ও Best Mountain Bikes হচ্ছে মাউন্টেন বাইক নিশের কিওয়ার্ড। নিশ সাইটের শুরুতে নিশ রিসার্চ এবং কিওয়ার্ড রিসার্চ তাই প্রথম ধাপ।

google.com/Adwords থেকে Keyword Planner টুলের মাধ্যমে কিওয়ার্ড রিসার্চ করা যায়।

কমপিটিশন অ্যানালিসিস : কিওয়ার্ড রিসার্চের পর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত কিওয়ার্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে বের করা। আপনার কিওয়ার্ড যদি 'বেস্ট মাউন্টেন বাইক' হয়, তবে এই কিওয়ার্ডে গুগলের প্রথম পেজে আছে, এমন ১০টি ওয়েবসাইটকে নিয়ে খুব ভালোমতো গবেষণা করা। কারণ, আপনাকে সেখান থেকে যেকোনো একজনকে সরিয়ে প্রথম দশে স্থান দখল করতে হবে। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কত শক্তিশালী সেটি না জেনে কখনোই কি তাদের সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা যায়?

ডোমেইন হোস্টিং নির্বাচন : আপনার নিশ ও কিওয়ার্ড নির্বাচন হয়ে গেলে পরবর্তী কাজ হচ্ছে ডোমেইন ও হোস্টিং নির্বাচন। ডোমেইন নাম হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের নাম, যেমন : সার্চ ইঞ্জিন গুগলের ডোমেইন হচ্ছে google.com। ডোমেইন নির্বাচন হয়ে গেলে পরের কাজটি হচ্ছে হোস্টিং নির্বাচন করা এবং সেটআপ করা। মনে রাখবেন ডোমেইন ও হোস্টিং ভালো কোম্পানি থেকে কেনা জরুরি। একই সঙ্গে আপনার মেইন কিওয়ার্ড বা কিওয়ার্ডের মূল অংশ ডোমেইন নামের সঙ্গে থাকাটা ভালো।

ওয়েবসাইট সেটআপ : ডোমেইন ও হোস্টিং রেডি হওয়ার পর আপনার কাজ হচ্ছে ওয়েবসাইট সেটআপ করা। বিশ্বব্যাপী ব্লগ ও ম্যাগাজিন সাইটের জন্য সাধারণত কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিএমএস) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় সিএমএস।

কনটেন্ট : সঠিকভাবে সাইট সেটআপ করার পর আপনার সাইটে কনটেন্ট দিতে হবে। অন্য কোনো সাইট থেকে কনটেন্ট নকল না করে অবশ্যই নিজস্ব ভালোমানের কনটেন্ট দিতে হবে। সাইটটি সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার পর এবার অ্যামাজন অ্যাসোসিয়েটে একটি অ্যাকাউন্টের জন্য আবেদন করুন। অনুমোদন পেলে নিজের সাইটে অ্যাফিলিয়েট লিংক বসানো শুরু করুন।

সামাজিক মাধ্যমে প্রচারণা : আপনার নিশ সাইট থেকে নিয়মিত আয় করতে সেটিকে গুগলের প্রথম পেজে বা পজিশনে নিয়ে যাওয়াটা জরুরি। তবে এটি সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই দ্রুত আয় করার জন্য আপনার সাইটের সোশ্যাল মিডিয়া প্রমোশন করতে হবে।

ফেইসবুক, গুগল প্লাস, পিনটারেস্ট, টুইটার, ইউটিউবের মাধ্যমে নিশ সাইটের প্রচারণা চালানো যেতে পারে।

লিংক বিল্ডিং : ওয়েবসাইটটি গুগলের প্রথমে র‍্যাংক করবে নাকি পরে–সেটি নির্ভর করছে দুটি বিষয়ের ওপর। প্রথম কনটেন্ট, দ্বিতীয় র‍্যাংক লিংক। এই র‍্যাংক লিংক তৈরির প্রক্রিয়াটি লিংক বিল্ডিং হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন জনপ্রিয় সাইটের লিংক আপনার সাইটে যুক্ত করাই মূলত লিংক বিল্ডিং। সাইটগুলোর ওয়েবমাস্টারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এসব লিংক যোগ করতে হয়। যত বেশি সাইটের লিংক যোগ হবে তত ভালো। আপনার ওয়েবসাইটটি গুগলের প্রথমে নিয়ে আসার জন্য লিংক বিল্ডিং খুবই জরুরি।

কনভার্সন রেট অপটিমাইজেশন : কনভার্সন রেট হচ্ছে কতজন ওয়েবসাইট ভিজিট করছেন এবং তাঁদের মধ্যে কতজন আপনার অ্যাফিলিয়েট লিংকের মাধ্যমে কোনো পণ্য কিনছেন তার হার। এই হার বাড়ানোর লক্ষ্যে যে কাজ, তাকে বলা হয় কনভার্সন রেট অপটিমাইজেশন। আপনার ওয়েবসাইট গুগলে একবার র‍্যাংক হয়ে গেলে আপনার কাজ হচ্ছে ভালোমতো কনভার্সন রেট অপটিমাইজেশন করা।

সাইট র‍্যাংক হলে অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে খুঁজে বের করুন কোন পোস্টগুলোয় সবচেয়ে বেশি ভিজিটর আসছে। সেই পোস্টগুলোকে ফাইন-টিউন করুন। যে কনটেন্টগুলো ওই পোস্টে আছে, সেগুলো আবারও এডিট করুন। নতুন কনটেন্ট অ্যাড করুন। কল-টু-অ্যাকশন বাটন ভালো করে অপটিমাইজ করুন।

স্কেলআপ : স্কেলআপ হচ্ছে কোনো সাইট একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছানোর পর সেটিকে আরো সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়া। সাইট একবার র‍্যাংক হয়ে গেলে এবং নিয়মিত আয় করা শুরু করলে এরপর আপনার কাজ কেবল সাইটটিকে স্কেলআপ করা এবং নিয়মিত আয়ের টাকা ঘরে তোলা। স্কেলআপ স্টেজে মূল লক্ষ্য থাকে, প্রতি মাসে কিভাবে ইনকাম আরো বাড়ানো যায়।

কোথায় শিখবেন

বিশ্বব্যাপী অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং খুবই জনপ্রিয়। অনলাইনেই তাই অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শেখার অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে। Marketever.comএ এ-বিষয়ক অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। এ ছাড়া Amazon Affiliate Bangladesh নামে ফেইসবুকে একটি গ্রুপের মাধ্যমেও বাংলাদেশি অভিজ্ঞ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারদের সহায়তা পাওয়া যায়।

অনলাইনে শেখার জন্য বাংলায় ভিডিও টিউটোরিয়ালও রয়েছে, AzonRockstar.com থেকে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের তথ্য পাওয়া যাবে। এ ছাড়া বাংলাদেশে মার্কেটেভার এবং এডু-মেকারসহ (www.edu-maker.com) বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হাতেকলমে এ-বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

লক্ষ করুন

- বেশিরভাগ অ্যামাজন পণ্যই বিভিন্ন কিওয়ার্ডে ক্রেতারা গুগলে সার্চ করে থাকে। তাই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন জানলে খুব সহজেই তাদের কাছে অ্যামাজনের এই পণ্যগুলো বিক্রি করা যায়।
- ইন্টারনেটে কেনাকাটার জন্য অ্যামাজন বিশ্বস্ত নাম। তাই যখনই কেউ অ্যামাজন ডটকমের কোনো প্রোডাক্ট রিকমেন্ড করে, তখন ভিজিটররা সেটি অনেক বেশি বিশ্বাস করে, কেনার প্রবণতা অনেক বেড়ে যায়।
- ধরুন, আপনি একটি সাইকেল বিক্রির ওয়েবসাইট করেছেন। সাধারণত, যাঁরা ক্রেতা, তাঁরা কেবল একটা সাইকেলই কিনবে না, সঙ্গে হেলমেট ও অন্যান্য সাইক্লিং সামগ্রীও কিনবে। অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারদের মজা হচ্ছে তিনি প্রচারণা চালাচ্ছেন কেবল সাইকেলের, কিন্তু বিক্রি হচ্ছে অন্যান্য পণ্য।
- অনলাইন কেনাকাটায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্রেতারা একাধিক পণ্য কিনে থাকেন। সুতরাং একটি পণ্যের প্রচারণা চালিয়ে প্রচুর পণ্য বিক্রির আয় পাওয়া যায়।
- একজন ক্রেতার পণ্য কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সাধারণত যে ধরনের তথ্য প্রয়োজন তার সবই অ্যামাজন ডটকমে রয়েছে। রয়েছে ইউজার রিভিউ, রেটিং থেকে শুরু করে প্রোডাক্টের একাধিক ছবি কিংবা ভিডিও। অ্যামাজনে পণ্য বিক্রির হার তাই অন্য সব ওয়েবসাইটের চেয়ে বেশি।

Nobin Back To Back Forma 03

লবণের ক্ষতি

লবণ পরিমাণ মতো গ্রহণ করা গেলে তা শরীরের জন্য উপকারী। কিন্তু নিজের অজান্তেই কিছু খাবারের মাধ্যমে শরীরে ঢুকছে বাড়তি লবণ, যা ক্ষতি করতে পারে। হতে পারে উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হার্টের অসুখ, কিডনির জটিলতা ইত্যাদি। সাধারণত একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য সারা দিনে ছয় গ্রাম বা এক চা চামচ পরিমাণ লবণই যথেষ্ট।

দৈনন্দিন প্রয়োজন

সুস্থ থাকলে বা ডাক্তারের নিষেধ বা নির্দেশনা না থাকলে দৈনন্দিন লবণের চাহিদা এ রকম। এক বছর বয়স পর্যন্ত এক গ্রাম, এক থেকে তিন বছর বয়স পর্যন্ত দুই গ্রাম, চার থেকে ছয় বছর পর্যন্ত তিন গ্রাম, সাত থেকে ১০ বছর পর্যন্ত পাঁচ গ্রাম, ১১ বা তার চেয়ে বেশি বয়সীদের জন্য ছয় গ্রাম।

লবণের কাজ

বাড়তি লবণের ক্ষতি

গ্রন্থনা : ডা. মুজাহিদুল ইসলাম
কালের কণ্ঠ ২৮ মার্চ ২০১৬

বিপদ যখন ভেতরে

কাঁচা লবণ বা পাতে লবণ কতটুকু নেওয়া হচ্ছে তা চাইলেই দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে একটু সতর্ক হলে অতিরিক্ত লবণ এড়ানোও যায়। কিন্তু কিছু খাবারের মাধ্যমে বাড়তি লবণ শরীরে ঢুকছে, যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মূলত শরীরে যে পরিমাণ লবণ প্রবেশ করে তার ৭৫ শতাংশই আসলে অন্য খাবারের মাধ্যমে ঢোকে। অনেকেই কিন্তু জানি না বিস্কুট, পাউরুটি, জুসের মাধ্যমেও শরীরে লবণ ঢোকে।

পাউরুটি ও রোল

সোডিয়ামে ভরপুর। যদিও মিষ্টি স্বাদ থাকায় বেশিরভাগ সময় লবণের অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না। লবণ কম গ্রহণ করতে চাইলে পাউরুটি, রোলস, বিস্কুটের মতো বেকারি পণ্য খাওয়া কমাতে হবে।

প্রক্রিয়াজাত মাংস

এখন অনেকেই হটডগ, চিকেন নাগেটের মতো নাশতা বাজার থেকে কিনে খান। কিন্তু এগুলোতে থাকে উচ্চ মাত্রার লবণ। দীর্ঘদিন সংরক্ষণের সুবিধা এবং বাড়তি স্বাদের জন্য এই লবণ দেওয়া হয়।

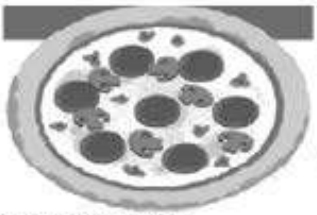

পিজা, বার্গার, পাস্তা

মধ্যম আকারের একটি পিজায় থাকে প্রায় দুই চা চামচ লবণ। তাই এর অর্ধেকটা খাওয়া মানে সারাদিনে যতটুকু লবণ গ্রহণ করা যায় তার পুরোটা শরীরে ঢুকে যাওয়া। বার্গার, পাস্তাতেও লবণ প্রায় একই মাত্রায় থাকে।

পোল্ট্রি

ফ্রিজারের রক্ষিত বা আগে থেকে প্যাকেটজাত পোল্ট্রি সামগ্রীতে লবণের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই বাজার থেকে তাজা মুরগি কিনে তার মাংস খাওয়াই বেশি নিরাপদ।

স্যুপ, নুডলস

এক বাটি স্যুপে আধা চা চামচের বেশি লবণ ব্যবহার করা হয়। প্যাকেটজাত নুডলসেও লবণের হার বেশি। তাই স্বাস্থ্যকর খাবার মনে করে এগুলো বেশি খাওয়া উল্টো বিপদ আনতে পারে।

স্যান্ডউইচ

স্যান্ডউইচে ব্যবহৃত প্রায় প্রতিটি উপাদানে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি লবণ ব্যবহার করা হয়। যেমন–পাউরুটি, ভেতরে ব্যবহৃত পেটি মাংস বা কাট মিট, সস। বরং স্যান্ডউইচ যদি খেতেই হয়, তবে পাউরুটির ভেতরে সালাদ দিয়ে তৈরি করে নিন।

শীতের ধাঁধা

১. পৃথিবীতে এ যাবৎকালের সবচেয়ে কম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে কোথায়?
ক. ভস্তক স্টেশন, অ্যান্টার্কটিকা। ৪-এ যাবেন।
খ. আইমিকোন, রাশিয়া। ৮-এ চলুন।

২. একদম সঠিক উত্তর। ঘটনাটি ঘটে কলোরাডোর সিলভার লেকে।

৩. দুঃখিত উত্তরটি ভুল।

৪. ১৯৮৩ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণাধীন ভস্তক স্টেশনে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কত তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। ওই সময় তাপমাত্রা ছিল হিমাঙ্কের নিচে ৮৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবার যেতে হবে ১৫-তে।

৫. উত্তরটি ভুল। তবে ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরের ৪ তারিখ এক বরফ ঝড়ে কলোরাডোর জর্জটাউনে ৬৩ ইঞ্চি বরফ জমেছিল।

৬. একদম সঠিক উত্তর। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্নোফ্লেক বা তুষারের টুকরাটি পড়ে ১৮৮৭ সালের ২৮ জানুয়ারি। আমেরিকার মন্টানার ফোর্ট কিওঘে। সেটি ছিল ১৫ ইঞ্চি চওড়া আর ৮ ইঞ্চি পুরু। এখন যাবেন ২০-এ।

৭. তুষার চিতাদের দেখা পাবেন কোথায়?
ক. নাইরোবি। আপনার গন্তব্য ২৪। খ. তিব্বত। ১৬-তে যাবেন।
গ. স্টকহোম। ৩০-এ চলুন।

৮. বিশ্বের সবচেয়ে শীতল জায়গাগুলোর একটি রাশিয়ার আইমিকোন। জানুয়ারি মাসে এখানে গড় তাপমাত্রা থাকে হিমাঙ্কের নিচে ৫০ ডিগ্রি।

৯. উত্তরটি নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

১০. একদম সঠিক। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার মেইনের বেথেলে বানানো হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্নোম্যানটি। এর উচ্চতা ১১৩ ফুট সাত ইঞ্চি। চটজলদি চলে যান ১১-তে।

১১. ১৯২৪ সালে প্রথম শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় কোন দেশে? ক. যুক্তরাষ্ট্র। ২৩-এ যাবেন। খ. ফ্রান্স। আপনার গন্তব্য ১৯।

১২. প্রবল শীত এলাকার প্রাণী মেরু ভল্লুক। গ্রিনল্যান্ড ছাড়া আমেরিকার আলাস্কা, কানাডাসহ আর্কটিক এলাকাগুলোয় এদের দেখা পাবেন। ধারণা করা হচ্ছে, এসব এলাকায় এখন কেবল ২০ থেকে ২৫ হাজার মেরু ভল্লুক টিকে আছে। এবার চলুন ২৫-এ।

১৩. পৃথিবীর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় তুষারের টুকরা কতটুকু চওড়া ছিল?
ক. ৯ ইঞ্চি। এবারের গন্তব্য ৩। খ. ১০ ইঞ্চি। যেতে হবে ৯-এ। গ. ১৫ ইঞ্চি। ৬-এ চলুন।

১৪. ভুল উত্তর। ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা গরম এক শহর। এখানে তুষার মানব তৈরিই হয়নি কখনো।

১৫. এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় স্নোম্যান বা তুষার মানবটি কোথায় তৈরি হয়েছে?
ক. বেথেল। ১০-এ চলুন। খ. ইয়ামাগাতা। ১৭-তে চলুন। গ. আদ্দিস আবাবা। ১৪-তে দেখুন।

১৬. উত্তরটি ঠিক হয়েছে। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার যে পাহাড়ি এলাকাগুলোয় তুষার চিতাদের বাস, এর মধ্যে তিব্বত অন্যতম। ধারণা করা হচ্ছে, পৃথিবীতে বুনো অবস্থায় টিকে থাকা তুষার চিতার সংখ্যা হাজার তিনেক। আপনার এবারের গন্তব্য ১৩।

১৭. বেথেলের স্নোম্যানটি বানানোর আগে সবচেয়ে বড় স্নোম্যানটি তৈরি করা হয়েছিল জাপানের ইয়ামাগাতায়। সেটির দৈর্ঘ্য ছিল ৯৬ ফুট ৭ ইঞ্চি।

১৮. সঠিক উত্তর। ইনুইটদের আমরা চিনি এস্কিমো নামে। তবে এই

আদিবাসীরা কিন্তু নিজেদের ইনুইট নামে পরিচয় করিয়ে দিতেই পছন্দ করে। তাদের বরফের তৈরি বাড়ি বা ইগলুর কথা কমবেশি সবাই জানি। কানাডা ছাড়াও আমেরিকার আলাস্কা, গ্রিনল্যান্ড আর রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় দেখা পাবেন ইনুইটদের। এখন চলুন ২৮-এ।

১৯. উত্তরটি সঠিক। প্রথম শীতকালীন অলিম্পিক হয় ফ্রান্সের চেমোনিতে। ১৬টি দেশ এতে অংশ নেয়। সবচেয়ে বেশি পদক পায় নরওয়ে। বেশ কয়েক ধাপ পিছিয়ে যান ৭-এ।

২০. গ্রিনল্যান্ডে কোন প্রাণীটির দেখা পাবেন?
ক. পেঙ্গুইন। চলুন ৩১-এ। খ. মেরু ভল্লুক। এবারের গন্তব্য ১২। গ. সিংহ। যেতে হবে ২২-এ।

২১. ইনুইটদের দেখা পাবেন কোথায়?
ক. কানাডা। যাবেন ১৮-এ। খ. সুইজারল্যান্ড। আপনার গন্তব্য ২৬।

২২. ভুল উত্তর। সিংহের দেখা পাবেন আফ্রিকা মহাদেশে আর ভারতের গির জঙ্গলে।

২৩. ভুল উত্তর। তবে ১৯৩২ সালে তৃতীয় শীতকালীন অলিম্পিকের আসর বসেছিল যুক্তরাষ্ট্রের লেক প্ল্যাসিডে।

২৪. কেনিয়ার নাইরোবিতে তুষার চিতাদের দেখা না পেলেও পাবেন চিতা বাঘসহ আরো অনেক প্রজাতির বন্যপ্রাণী।

২৫. ইউকাসসাভি বরফের হোটেল কোন দেশে অবস্থিত?
ক. নরওয়ে। ২৭-এ চলুন। খ. সুইডেন। যেতে হবে ২৯-এ।

২৬. ভুল উত্তর। সুইজারল্যান্ড শীতে বেড়ানোর জন্য চমৎকার একটি জায়গা। এখানে বরফও পড়ে বেশ। তবে ইনুইটর এখানে কোনো কালেই ছিল না।

২৭. দুঃখিত, ভুল উত্তর। ফিরে যান ২৫-এ।

২৮. আমেরিকায় ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি বরফ পতন রেকর্ড করা হয় ১৯২১ সালে। বলুন তো কত ইঞ্চি বরফ জমেছিল?
ক. ৬৩ ইঞ্চি। যাবেন ৫-এ। খ. ৭৬ ইঞ্চি। আপনার গন্তব্য ২।

২৯. সঠিক উত্তর। উত্তর সুইডেনের ইউকাসসাভি গ্রামে এই বরফের হোটেলটির অবস্থান। এটিই পৃথিবীর প্রথম বরফের তৈরি হোটেল। ১৯৯০ সালে প্রথম চালু হয়। তার পর থেকে প্রতিবছর নতুনভাবে তৈরি হয়। খোলা থাকে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। কাছের টর্নে নদী থেকে বরফের চাঙড় তুলে এনে বানানো হয় হোটেলটি। এবার চলুন ২১-এ।

৩০. দুঃখিত, উত্তরটি ভুল।

৩১. গ্রিনল্যান্ড তো বটেই, পুরো আর্কটিক বা উত্তরমেরু অঞ্চলের কোথাও পেঙ্গুইনরা বসবাস করে না। এদের বেশি দেখা যায় অ্যান্টার্কটিকা বা দক্ষিণমেরুতে। এ ছাড়া আর্জেন্টিনা, চিলি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এরা আছে। গেলাপাগোস দ্বীপেও আছে পেঙ্গুইন।

ইশতিয়াক হাসান
কালের কণ্ঠ ১ জানুয়ারি, ২০১৭

বাগ্‌যুদ্ধে জয়ী হতে ৯টি বৈজ্ঞানিক টিপস

বিতর্ক সব সময় যৌক্তিক হয়ে ওঠে না। নানা কৌশলে তর্ক-বিতর্কে জয়লাভ আসে। এ জন্য প্রতিপক্ষকে ভালোভাবে বুঝতে হয়। যেকোনো বিতর্কে আপনাকে কিছু কৌশল রপ্ত করতে হবে। তর্কে জেতার এই কৌশলগুলো রীতিমতো বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। জেনে নিন বাগ্‌যুদ্ধে জয়ী হওয়ার মন্ত্র।

১. আপনার আচরণ অবশ্যই ভদ্র-সভ্য হতে হবে। তাই বিতর্কে প্রতিদ্বন্দ্বীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সম্মান দেখান। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার পলিটিক্যাল সাইকোলজিস্ট পিটার ডিটো বলেন, যখন মানুষ তার মূল্যকে বৈধভাবে উপস্থাপন করতে চায়, তখন নিজ চিন্তাধারার বিপরীতমুখী তথ্যগুলোও মনে ধারণ করে রাখে। আর এ থেকেই বিপরীত মতের প্রতিও শ্রদ্ধাবোধ জাগে।

২. কারো মতাদর্শের ওপর আক্রমণাত্মক বাগ্‌যুদ্ধ চালালে পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে থাকে। মানুষের সম্মতি বাগিয়ে আনতে চাইলে চরমভাবে মতৈক্য প্রকাশের চর্চা করে যান। অন্যের বক্তব্যকে আক্রমণ নয়, বরং নিজের যুক্তিকে জোরালো বলে প্রমাণ করুন।

৩. ২০১৩ সালে ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডোর মনোবিজ্ঞানী ফিলিপ এম ফ্রেনব্যাচ তাঁর গবেষণায় জানান, দুই ঘরানার রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী দুটি দল যখন তর্কে নামে, তখন 'কেন' তাদের মতাদর্শ সেরা প্রমাণের চেয়ে 'কীভাবে' সেরা ব্যাখ্যা করাটা বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। তাই বিতর্কে জয়ের মালা পরতে 'কেন' দিয়ে নয়, 'কীভাবে' আপনিই সেরা, তা তুলে ধরুন।

৪. বিপরীত পক্ষকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পিক্সারের সহপ্রতিষ্ঠাতা এড ক্যাটমুল কখনোই স্টিভ জবসের সঙ্গে বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্ত নিয়ে উচ্চবাচ্য করতেন না। এড বলেন, আমি কোনো যুক্তি দাঁড় করালে স্টিভ তা তৎক্ষণাৎ এর খুঁত বের করে ফেলতেন। কারণ তিনি আমার চেয়ে অনেক দ্রুত চিন্তা করতে পারতেন। কিন্তু জবস কিছু বলার পর আমি প্রয়োজনে কিছুদিন সময় নিয়ে ভাবতাম এবং জোরালো যুক্তি নিয়ে হাজির হতাম।

৫. এমন প্রশ্ন ছুড়ে দিন, যেন অন্য পক্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বক্তব্যের ঝুড়ি খুলে দেয়। যেমন–পৃথিবীর সব টাকা পেলে আপনি কী করবেন–এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে যে কেউ তার মনের যাবতীয় চিন্তাভাবনা উজাড় করে দেবে।

৬. ২০১৩ সালে ইউনিভার্সিটি অব ইউতাহ'র ম্যানেজমেন্টের প্রফেসর ব্রায়ান বনার বলেন, উশৃঙ্খলতা, লিঙ্গ, জাতিসত্তা এবং আত্মবিশ্বাসের ওপর বিচার করে মানুষ কারো প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। কাজেই অন্যের নজর কাড়তে স্রেফ স্মার্টভাবে কথা বললেই হবে না। মূলত সেখানে আত্মবিশ্বাসী এবং বক্তব্যে খোলামেলা ভাব থাকতে হবে।

৭. কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষক অ্যানার ট্যাল এবং ব্রায়ান ওয়ানসিংক তাঁদের সাম্প্রতিক গবেষণায় জানান, মানুষ সাধারণত বিজ্ঞানীদের ওপর বিশ্বাস রাখে। আর গ্রাফের মাধ্যমে তথ্য তুলে ধরাটা অনেকটা বৈজ্ঞানিক বলেই মনে করে সবাই।

৮. সামাজিকভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে যুক্তির পক্ষে উদাহরণ হিসেবে টানলে তা আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। 'ইনফ্লুয়েন্স : দ্য সাইকোলজি অব পারসুয়েশন' বইয়ের লেখক রবার্ট সিয়ালদিনি বলেন, নিজের মতকে অন্যের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করতে সমাজ থেকে কোনো উদাহরণ টানুন।

৯. নিজের মতের পক্ষে ঐক্য তৈরি করুন। এটিই তর্কে জেতার মোক্ষম অস্ত্র। বিজ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। কোনো পরীক্ষা বা অন্য কোনো বিষয়ে সবার কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয়। যে মতের পক্ষে বেশি বিজ্ঞানী আছেন, তাঁদের মতামতই সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে। তর্কযুদ্ধে শ্রোতাদের এমন কোনো ঘটনা বলুন, যা আপনার বা অনেকের জীবনে একই অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। এর সূত্র ধরে নিজের বক্তব্য পেশ করুন। এতে বক্তব্য শেষে আপনার সমর্থনে সবাইকে 'হ্যাঁ-সূচক' মাথা নাড়তে দেখবেন।

■ সাকিব সিকান্দার
বিজনেস ইনসাইডার অবলম্বনে
২৩ মে, ২০১৫

Nobin Back To Back Forma 02

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১১

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১.	সাথী রানী রায়, ৯০৩/২০১১ পিতা: গিরীন্দ্র নাথ বর্মন গ্রাম: জোত বাড়াইপাড়া, ডাকঘর ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএসএস (অনার্স) ৩য় বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
২.	আয়েশা ছিদ্দিকা, ৯০৪/২০১১ পিতা: মো. আলমগীর মিয়া আরজু গ্রাম ও ডাকঘর: সৈয়দের খোলা, থানা: শিবপুর, জেলা: নরসিংদী।	বিএসসি (অনার্স) ৩য় বর্ষ, গণিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩.	নিশাত সাহানা, ৯০৫/২০১১ পিতা: শেখ আব্দুল হক গ্রাম: সবুজ পল্লী, ডাকঘর: চালনা বাজার, থানা: দাকোপ, জেলা: খুলনা।	এমবিবিএস ৩য় বর্ষ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
৪.	দেবশ্রী অধিকারী, ৯০৬/২০১১ পিতা: রমেন্দ্রনাথ অধিকারী রায়েন্দা বাজার, শহীদ মিনার রোড, শরণখোলা, বাগেরহাট।	ডিপ্লোমা ইন ম্যাটস, ৩য় বর্ষ, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল, বাগেরহাট।
৫.	বিথী আক্তার, ৯০৭/২০১১ পিতা: বাদল মোল্লা গ্রাম: গোলাকান্দাইল, ডাকঘর: ভুলতা, থানা: রূপগঞ্জ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ।	বিবিএস (অনার্স) ৩য় বর্ষ, হিসাববিজ্ঞান সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।
৬.	তানজারা সেমন্তী, ৯০৮/২০১১ পিতা: মো. জহুরুল ইসলাম গ্রাম: আদিপৈত, ডাকঘর ও থানা: মেলান্দহ, জেলা: জামালপুর।	বিএ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, বাংলা সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর।
৭.	মোছা. তাজনুন্নাহার আক্তার ময়না, ৯০৯/২০১১ পিতা: মো. তোফাজ্জল হোসেন গ্রাম: একবারপুর পূর্ব পাড়া, ডাকঘর: গোপীগ্রাম, থানা: পীরগঞ্জ, জেলা: রংপুর।	বিএসসি ৩য় বর্ষ, নার্সিং ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা।
৮.	সুরাইয়া সুলতানা, ৯১০/২০১১ পিতা: মো. দেলোয়ার হোসেন গ্রাম: গাড়ামাসী, ডাকঘর: চন্দনগাতী, থানা: বেলকুচি, জেলা: সিরাজগঞ্জ।	এমবিবিএস ৪র্থ বর্ষ রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর।
৯.	শামীমা আক্তার, ৯১১/২০১১ পিতা: খলিলুর রহমান গ্রাম ও ডাকঘর: করাব, থানা: লাখাই, জেলা: হবিগঞ্জ।	বিবিএ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, ব্যবস্থাপনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
১০.	গীতা রানী, ৯১২/২০১১ পিতা: চম্পনাথ বর্মন গ্রাম: পূর্ব বেজগ্রাম, ডাকঘর: নওদাবাস, থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, বাংলা কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।
১১.	সুলতানা তাসনীম, ৯১৩/২০১১ পিতা: মো. আনোয়ারুল হক ৭নং উপশহর, বাসা নং: জি-৫/৬, দিনাজপুর।	এমবিবিএস ৩য় বর্ষ রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর।
১২.	মোছা. স্বপ্না বেগম, ৯১৪/২০১১ পিতা: মো.আব্দুস ছালাম মিয়া গ্রাম: নুরপুর, ডাকঘর: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	বিএসএস (পাস) ৩য় বর্ষ, সমাজবিজ্ঞান শুকুরেরহাট ডিগ্রি কলেজ, রংপুর।
১৩.	জাকিয়া বিনতে সাহিদ, ৯১৬/২০১১ পিতা: মো.সাহেদার রহমান গ্রাম: টংভাঙ্গা, ডাকঘর ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএসসি (ইঞ্জি.) ৩য় বর্ষ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ক্রমিক নং	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১৪.	সায়লা রহমান, ৯১৭/২০১১ পিতা: মো. তজিবর রহমান গ্রাম: মিঠাপুর (ধলাইর চর), ডাক ও থানা: আলফাডাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর।	বিএসএস (অনার্স) ২য় বর্ষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৫.	মোছা. আরিফুন্নাহার অন্ত, ৯১৯/২০১১ পিতা: মো. আজগর আলী গ্রাম: কঞ্চিপাড়া, ডাকঘর: ভবানীগঞ্জ, থানা: ফুলছড়ি, জেলা: গাইবান্ধা।	বিএসএস (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, লোক প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৬.	রাজিয়া সুলতানা, ৯২০/২০১১ পিতা: আব্দুর রশিদ গ্রাম: ধনার পাড়া, ডাকঘর: ভবানীগঞ্জ, থানা: ফুলছড়ি, জেলা: গাইবান্ধা।	বিবিএ (অনার্স) ৩য় বর্ষ বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
১৭.	সাবরিনা আফরোজ, ৯২১/২০১১ পিতা: মো.হাবিবুর রহমান গ্রাম ও ডাকঘর: কাফিলা, থানা: বাকেরগঞ্জ, জেলা : বরিশাল।	বিএসসি (অনার্স) ২য় বর্ষ মাইক্রোবায়োলজি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
১৮.	শারমিন ইসলাম, ৯২২/২০১১ পিতা: মো. নজরুল ইসলাম গ্রাম: বড় পাগলা, ডাকঘর: বিবিরচর, থানা: নকলা, জেলা: শেরপুর।	বি.ফার্ম (অনার্স), ৩য় বর্ষ ফার্মেসি, প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
১৯.	মেরীন তানজিন মীম, ৯২৩/২০১১ পিতা: শরীফ মতিউর রহমান গ্রাম: শংকর পাশা, ডাকঘর: নন্দনপুর, থানা: সাঁথিয়া, জেলা: পাবনা।	বিএসসি (ইঞ্জি.) ৩য় বর্ষ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
২০.	ইসরাত ইয়াফা, ৯২৪/২০১১ পিতা: মো. নজরুল ইসলাম গ্রাম: টংভাঙ্গা, ডাকঘর ও থানা: হাতীবান্ধা, জেলা: লালমনিরহাট।	বিএসসি (ইঞ্জি.) ৩য় বর্ষ, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
২১.	মারিয়া আফরোজ, ৯২৫/২০১১ পিতা: মো. নিজাম বাহাদুর গ্রাম ও ডাকঘর: সোহাগদল, থানা: স্বরূপকাঠী, জেলা: পিরোজপুর।	বিএসসি (অনার্স) ২য় বর্ষ গণিত, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২২.	শারমিন আক্তার, ৯২৬/২০১১ পিতা: মো.আমান উল্যাহ গ্রাম: কোকালী, ডাকঘর: বক্সগঞ্জ বাজার, থানা: নাঙ্গলকোট, জেলা: কুমিল্লা।	এমবিবিএস ৩য় বর্ষ নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ঢাকা।
২৩.	মেরিনা, ৯২৭/২০১১ পিতা: আ. হালিম গ্রাম: বাকশিমইল, ডাকঘর ও থানা: মোহনপুর, জেলা: রাজশাহী।	বিএসএস (অনার্স) ৩য় বর্ষ অর্থনীতি, রাজশাহী সরকারী কলেজ রাজশাহী।
২৪.	ফারহানা জান্নাত জুঁই, ৯২৯/২০১১ পিতা: মো. জাহিদুল ইসলাম গ্রাম: নাগেরপাড়া, ডাকঘর ও থানা: মেলান্দহ, জেলা: জামালপুর।	বিএসএস (অনার্স) ৩য় বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজ ময়মনসিংহ।
২৫.	আয়শা ছিদ্দীকা, ৯৩০/২০১১ পিতা: মো. রাশেদুল ইসলাম গ্রাম: নুরপুর, ডাকঘর: রানীপুকুর, থানা: মিঠাপুকুর, জেলা: রংপুর।	বিএসএস (অনার্স) ২য় বর্ষ উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
২৬.	আসমা আক্তার, ৯৩১/২০১১ পিতা: মোজাফ্ফর হোসেন গ্রাম: কচুয়া, ডাকঘর ও থানা: কচুয়া, জেলা: বাগেরহাট।	বিএ (পাস), ৩য় বর্ষ, মানবিক শহীদ শেখ আবু নাসের মহিলা ডিগ্রি কলেজ বাগেরহাট।

চলবে...

মাথায় কত প্রশ্ন আসে

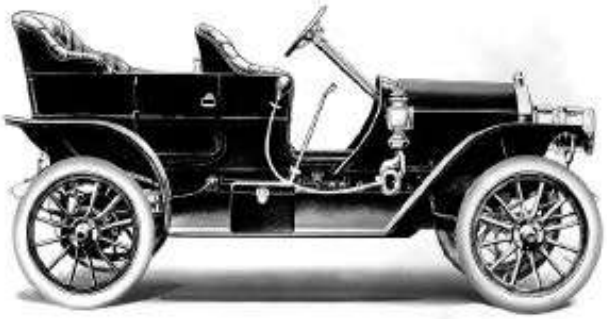

প্রথম মোটর গাড়ি কে বানিয়েছিল?

বেলজিয়ামের জেস্যুট পাদরি ফার্দিন্যান্ড ভারবিয়েস্ট (মৃত্যু: ১৬৮৭ খ্রি.) তাঁর লেখা 'অ্যাস্ট্রনমিয়া ইউরোপিয়া' গ্রন্থে প্রথম ২ ফিট লম্বা একটি মোটরগাড়ির মডেলের ছবি ও বর্ণনা দেন। ভারবিয়েস্ট-কে ঐ ধরনের একটি গাড়ি বানানোর প্রেরণা দিয়েছিলেন সম্ভবত জোভানি ব্র্যান্কা; তিনি প্রথম বাষ্পচালিত টারবাইন যন্ত্রের নকশা এঁকেছিলেন। তাঁর (ব্র্যান্কার) বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৬২৯ খ্রি.তে। অবশ্য তার ঢের আগে ৮০০ খ্রি. পূ.-তে চীনে চু (chu) রাজবংশের রাজত্বকালে 'আগুনে চলা' এক ধরনের গাড়ির বিবরণ পাওয়া যায়। সম্রাট খাং-ছি-এর পাঠাগারে রাখা একটি পাণ্ডুলিপিতে তেমন যান্ত্রিক গাড়ির কথা প্রথম জানা গেছে।

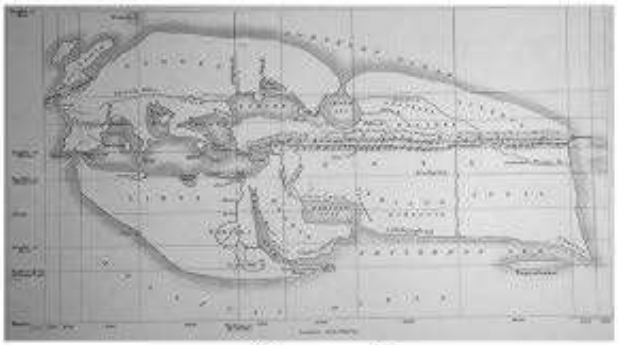

সবচেয়ে পুরনো মানচিত্র কোনটি?

সবচেয়ে পুরোনো মানচিত্রটির প্রথম সন্ধান পান পুরাতাত্ত্বিকেরা, ইরাকে ইউফ্রেটিস নদীর কাছাকাছি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানোর সময়। মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল খ্রিস্ট পূর্ব ৩৮০০ অব্দের নকশা আঁকা এক মৃৎফলক; আসলে ঐ ফলকে আঁকা ছিল প্রাচীন মেসোপটেমিয়া রাজ্যের মানচিত্র। এটাই এযাবৎ আমাদের হাতে আসা সব ম্যাপের মধ্যে পুরানো। সবচেয়ে প্রাচীন হারানো মানচিত্রের বয়স ৬০০ বছরের বেশি, ইসাডোরা সেভিলেস ১৪৭২ সালে এটি প্রকাশ করেন।

কোন্ বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনি সবচেয়ে দূর থেকে শোনা যায়?

১৯৩০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের অ্যাটলান্টা সিটির অডিটোরিয়ামে বসানো ৩৬৫ অশ্বশক্তিসম্পন্ন এক অতিকায় বৈদ্যুতিক অরগ্যান হচ্ছে সেই অসাধারণ যন্ত্র। ২৫টি 'ব্র্যাস ব্যাণ্ড' একসঙ্গে বাজানো হলে যেমন কানে–তালে-ধরানো আওয়াজ হয়, তেমন জোরে ঐকতান ওটাতে বাজানো সম্ভব; ভাগ্য ভালো যে ঐ অরগ্যানটির একাংশ এখন বিকল হয়ে থাকায় ওটা বাজানো হচ্ছে না। ওটা বানিয়েছেন ঐ শহরের ইলেকট্রনিকস বিশেষজ্ঞ কয়েকজন বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা।

সিগারেটের ধোঁয়া আমাদের কী ক্ষতি করে?

একটি সিগারেট মানুষের আয়ু সাড়ে পাঁচ মিনিট কমিয়ে দেয়। সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রায় ৩০০ রকম রাসায়নিক পদার্থ আছে, তার মধ্যে অন্তত ১৬টি পদার্থ নিশ্চিতভাবে প্রাণীদেহে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া এই ধোঁয়ায় মারাত্মক কার্বন মনো-অক্সাইড ও সায়ানাইড মিশ্রিত আছে। এই ধোঁয়া মুখ, শ্বাসনালী ও ফুসফুসের দ্বারা শোষিত হয় এবং শরীরের রক্ত প্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে দেহের অন্যত্রও প্রভাব সৃষ্টি করে। ব্রিটেনের রয়্যাল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় ইংল্যান্ডে গড়ে প্রতি বছর ৩৫ থেকে ৬৪ বছরের প্রায় ২০,০০০ পুরুষ ও ৩,৫০০ নারী ধূমপানের কারণে মৃত্যুবরণ করে থাকে। যারা বেশি ধূমপান করে তাদের পাঁচ জনের মধ্যে দুজনই ৬৪ বছর বয়সের আগেই মারা যায়। ফুসফুসের ক্যান্সারের সঙ্গে ধূমপানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সারা পৃথিবীব্যাপী গবেষণার মাধ্যমে আজ চূড়ান্তভাবে ধরা পড়েছে। যাঁরা দিনে পাঁচটি সিগারেট খান তাঁদের ফুসফুসের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা যাঁরা ধূমপান করেন না তাঁদের থেকে পাঁচগুণ বেশি। যাঁরা ৩০টি সিগারেট খান তাঁদের এই সম্ভাবনা ৩০ গুণ বেশি। ফুসফুসের

ক্যান্সার ছাড়াও ধূমপায়ীদের মধ্যে হৃদযন্ত্রের অসুখ, হাঁপানি ও ব্রংকাইটিসের আক্রমণে মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি। আগে প্লেগ, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারিতে যেভাবে ব্যাপক হারে মৃত্যু ঘটত বর্তমানে ধূমপানের কারণে তাই ঘটছে।

মানুষ সভ্য হয়েছে কবে?

জনৈক সমাজতাত্ত্বিক পরিহাস-জল্পনার সূত্রে বলেছেন, পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রথম আবির্ভাবের ক্ষণ থেকে আজ পর্যন্ত সময়টিকে যদি এক বছরের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে মানুষ নাকি সভ্য হয়েছে ঐ বছরের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে, বিকেল ৫টার পর। অর্থাৎ মানব অস্তিত্বের ২৯০ ভাগের ২৮৯ অংশই নাকি কেটেছে অসভ্যতার অন্ধকারে।

নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন প্রায় ১,৭৫,৫০০০ বছর হলো মানুষ এসেছে পৃথিবীতে। তবে পুরোপুরি সভ্য ভদ্র হতে তার সময় লেগেছে বেশ কয়েক হাজার বছর। পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে কীভাবে প্রথম সভ্যতার দ্বীপ জ্বলে উঠেছিল সে বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের গবেষণার অন্ত নেই। এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত রয়েছে।

ধোঁয়া দূষিত কেন?

ধোঁয়া বলতে সাধারণত আমরা কালো বা ধূসর রঙের ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত বায়বীয় পদার্থ বুঝি। কয়লা এবং ছাই-এর অজস্র সূক্ষ্মকণা থাকে বলেই ধোঁয়ার রং কালো দেখি। কিন্তু এই ধোঁয়ার মধ্যেই সম্পূর্ণ বর্ণহীন, গন্ধহীন, দু-একটা মারাত্মক রকম দূষিত গ্যাস মিশে থাকে যা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর একটির নাম হলো কার্বন মনো-অক্সাইড। পৃথিবীতে প্রতি বছর ২৩০০ লক্ষ টন কার্বন-মনোঅক্সাইড বাতাসে এসে মিশছে এবং বাতাসকে মারাত্মক রকম দূষিত করে তুলছে। এর মধ্যে প্রায় ১৮০০ লক্ষ টন কার্বন মনো-অক্সাইড তৈরি হয় ডিজেল ও পেট্রোলচালিত ইঞ্জিনগুলো থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কার্বন মনো-অক্সাইডের জন্য মোটরগাড়িগুলি দায়ী।

পেট্রোল ইঞ্জিন ও কলকারখানার ধোঁয়ার সঙ্গে আর একটি ক্ষতিকর গ্যাস প্রচুর পরিমাণে বাতাসে এসে মিশছে। তা হলো নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, খয়েরি-হলুদ রঙের ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত গ্যাস। শরীরের পক্ষে এটি অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই গ্যাসটি আবার স্মগ বা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করতে অদ্বিতীয়। বড় বড় শহরে শীতকালে এই স্মগ বা ধোঁয়াশা দেখা যায়। কয়েকটি হাইড্রোকার্বন ও ওজন গ্যাসের সঙ্গে অত্যন্ত জটিল কয়েকটি রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড এই ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই ধোঁয়াশা খেতের ফসল ও গাছপালার পক্ষেও ক্ষতিকর।

এ ছাড়া পেট্রোল, কয়লা, তেল, কাঠ ইত্যাদি পোড়াবার ফলে নানারকম হাইড্রোকার্বন ও অন্যান্য গ্যাসও বাতাসে গিয়ে জমা হচ্ছে। প্রতি বছর ৯০ বিলিয়ন টন হাইড্রোকার্বন পৃথিবীতে এইভাবে তৈরি হচ্ছে।

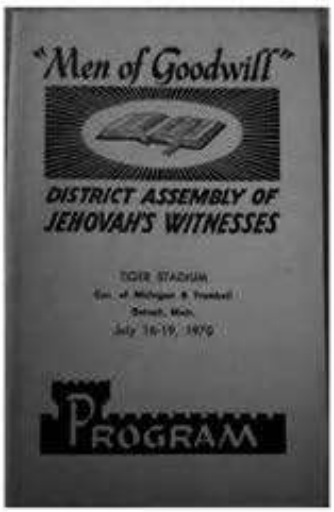

বিশ্বের বৃহত্তম উপন্যাস কোনটি?

বিশ্বের বৃহত্তম উপন্যাস লেখা হয়েছিল ফরাসি ভাষায়, নাম–'ল্যা ওমেস্ ডে বনে ভোলন্তে', ২৭ খণ্ডে, (১১৩২-৪৬ খ্রি.)। লিখেছিলেন জুলে রোঁমা ওরফে লুই অঁরি জাঁ ফারিগোলে (জন্ম: ২৬ আগস্ট ১৮৮৫)। এর ইংরেজি অনুবাদের নাম–'মেন অব গুড উইল' (১৪ খণ্ডে, ১৯৩৩-৪৬-এ প্রকাশিত)। বাংলায় অন্নদাশংকর রায়ের 'সত্যাসত্য' বৃহত্তম উপন্যাস।

Nobin Back To Back Forma 01